সংকলন

রেজিঃ ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০২
পৌষ ১৪২১ । জানুয়ারি ২০১৫ । ৩২ পৃষ্ঠা । ১০ টাকা

অকল্যাণে নয়-
ধর্মবিশ্বাস
মানুষের কল্যাণে
ব্যবহৃত হোক

অপরাজনীতি
বন্ধ হোক

দৈনিক বজ্রশক্তি

সম্পাদকীয়

ধর্ম কী? প্রকৃত ধার্মিক কারা?

ধর্ম শব্দের অর্থ- 'স্বভাব, শক্তি, গুণ' অর্থাৎ বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সেই নীতি যা সে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি প্রাণীরই সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিগত কিছু গুণাগুণ থাকে যাকে উক্ত পদার্থ বা প্রাণীর ধর্ম বলে। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো, উত্তাপ দেওয়া, আলো দেওয়া। এখন যদি আগুন কোনো কারণে পোড়াতে ব্যর্থ হয়, উত্তাপ না দেয়, আলো নির্গত না করে তবে ঐ আগুন শুধু প্রতিচ্ছবি, শুধুমাত্র অবয়ব ধারণ করে আছে। একইভাবে মানুষেরও কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, ধর্ম রয়েছে; এই ধর্মগুলির কারণেই সে মানুষ, তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাহলে মানুষের সেই ধর্মগুলি কী? মানুষের ধর্ম হলো মানুষের অভ্যন্তরস্থ মানবীয় গুণাবলী। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, দয়া, মায়া, ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, মানবতা, সৌহার্দ্যতা, বিবেক, সহমর্মিতা, ঐক্য, শৃঙ্খলা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী হলো মানুষের ধর্ম। যতক্ষণ একজন মানুষ অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয়, অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হয়, অপরকে সহযোগিতা করে, আর্তপীড়িতের পাশে দাঁড়ায় ততক্ষণ সে ব্যক্তি ধার্মিক হিসেবেই পরিগণিত হবার যোগ্য। এতে সে স্রষ্টার পূজা-উপাসনা-অর্চনা, নামাজ, রোজা, স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করুক আর না করুক। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন হারিয়ে যায় তখন তার কোনো ধর্ম থাকে না। সে তখন ধর্মহীন হয়ে যায়। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না, পশুতে পরিণত হয়।

আজকে দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, গেরুয়া বসন, তিলক-চন্দন ইত্যাদি থাকলে, হাদিস-কোর'আন বা শাস্ত্রবাক্য মুখস্থ থাকলে মনে করা হয় সে ব্যক্তি ধার্মিক। কিন্তু না, এটা ধার্মিকতার সংজ্ঞা নয়। ধার্মিক হল সেই ব্যক্তি যিনি মানবতাকে লালন করেন, মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্মিকের আজ বড়ই অভাব, লেবাসসর্বস্ব বক ধার্মিকের অভাব নেই, ধর্মব্যবসায়ীর অভাব নেই, কিন্তু ধর্ম তথা মানবতার জন্য জীবন উৎসর্গকারীর বড়ই অভাব। প্রত্যেকে যদি তার নিজ নিজ ধর্মকে সুচারুরূপে পালন করতেন তাহলে আজকের পৃথিবী এত অশান্তিময় হতো না। চারিদিকে এত দুঃখ, কষ্ট, ক্রন্দন আর হাহাকার থাকত না। আমরা চাই প্রত্যেকে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভ করে, স্রষ্টা কেন ধর্ম দিয়েছেন সেটা উপলব্ধি করে সে ধর্ম পালন করুক। আল কোর'আনে স্রষ্টা বলছেন, আমি মানুষকে এবাদত ছাড়া আর কোন কিছু করার জন্য সৃষ্টি করি নি। (সুরা যারিয়াত ৫৬)। এবাদত করার আগে জানতে হবে কী সেই এবাদত। শুধু মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-প্যাগোডায় মশগুল হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলেই কি এবাদত করা হয়? না। এবাদত হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। মানুষের শান্তির জন্য কাজ করা। মানুষ যেন শান্তিতে দরজা খুলে ঘুমাতে পারে, মানুষ যেন দু'মুঠো খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে এই নিশ্চয়তা বিধান করাই এবাদত। সমাজের নিপীড়ন-নির্যাতন দূর করার জন্য যিনি চেষ্টা করবেন তিনিই স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবেন। মানবজীবন তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

আমরা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা মানবজাতিকে ধর্ম কী, এবাদত কী, মানবজনমের সার্থকতা কিসে, কীভাবে ধর্মকে জাতির উন্নয়ন ও প্রগতিতে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা যদি মানুষকে এই সত্যগুলি বোঝাতে পারি এবং মানুষকে সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তবে আর কেউ ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, ধর্মবিশ্বাসকে ভুল পথে পরিচালিত করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে পারবে না। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে ধর্মই হবে প্রধান হাতিয়ার।

আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এই কাজে আমাদের কোনো ১. অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই, ২. আমাদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। কোনো প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া আমাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং এটা করতে গিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত সম্পদ অকাতরে দান করছি। আমরা আমাদের এই জাতিটাকে বিশ্বের দরবারে একটা সমৃদ্ধিশালী-শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এটাই আমাদের এবাদত। যতদিন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অন্যায়-অবিচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত নির্মূল হয়ে মানবজাতি এক জাতি না হবে ততদিন আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এনশা'ল্লাহ। আমাদের এই সংকলন এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

সূচিপত্র

- *বিশ্বরাজনীতিতে ধর্ম এখন এক নম্বর ইস্যু- ২*
- *রাজনীতিতে কালো ছায়া: পরিবর্তনের সময় এখনি- ৫*
- *মানবজাতিকে 'ধর্মহীন মুক্তমনা করার চেষ্টা কতটুকু সফল হলো?- ৮*
- *আকিদা বিহীন ঈমান অর্থহীন- ১৩*
- *এই দীনে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই- ১৪*
- *বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফল- ১৬*
- *মানবজাতিকে ধর্মহীন করার শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু শান্তিদায়ী- ১৯*
- *ইবাদত কী? কোন কাজ ইবাদত?- ২১*
- *প্রচেষ্টা ও সংগ্রামহীন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না- ২২*
- *ধর্মবিশ্বাসে জোর জবরদস্তি চলে না-২৩*
- *মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই আল্লাহর অভিপ্রায়- ২৫*
- *এক নজরে হেযবুত তওহীদ- ২৮*
- *মাননীয় এমামুয্‌যামানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি- ৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা, ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৬৭৩-৯৯০৪৬৮, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৭৫৩-৯৯৭০০১, ০১১৯১-১০১৩২৪
ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

বিশ্বরাজনীতিতে ধর্ম এখন এক নম্বর ইস্যু

যারা জাতির কর্ণধার অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতিতে বর্তমান সময়ে ধর্ম এক নম্বর ইস্যু, তাই মানুষের ধর্মানুভূতিকে অবজ্ঞা করার বা খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই, একেবারে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আমরা দেখি ইউরোপে সেক্যুলারিজমের জয়জয়কার। তারা তাদের সেই ধ্যান-ধারণাকে সবার উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসিক গঠনও সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের মানুষের পক্ষে ধর্মহীন জীবনব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ইউরোপ ছিল ধর্মবঞ্চিত। জনগণের অধিকাংশই ছিল মূর্তিপূজক প্যাগান। বর্বর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিরুপায় প্রজার নিষ্পেষণই ছিল ইউরোপের জীবনব্যবস্থা। ঈসা (আ.) এর আনীত ধর্মের আংশিক পরিবর্তিত রূপটি যখন ইউরোপে প্রচারিত হলো, তখন জনগণ এটাকেই তাদের মুক্তির পথরূপে বরণ করে নিল। কিন্তু হায়! সেখানে তো সামষ্টিক জীবন পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই জনগণের মুক্তি মিলল না। জন্ম নিল ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি, তারা নিজেদের মুখের কথাকেই ধর্ম বলে জনগণের উপর চাপিয়ে দিল। তারা সৃষ্টি করল মধ্যযুগীয় বর্বরতা (Medieval barbarism) নামক মানব ইতিহাসের কালো অধ্যায়। মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের গবেষণার ফল হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল নতুন বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থা, যার দ্ব্যর্থাত্মক, বিভ্রান্তিকর ও চমকপ্রদ নাম ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)। এই মতবাদের চর্চায় ধর্ম কার্যত ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্দি হলো। এই ইউরোপীয় জাতিগুলো যখন দিগ্বিজয়ে বের হলো, তারা পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধ ও অ-সমৃদ্ধ জাতিকে তাদের গোলামে পরিণত করে ফেলল।

ধর্মই শান্তির একমাত্র উৎস এ কথাটি ভারতবর্ষের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে জেনে এসেছে, দেখে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে ভারতে সনাতন শাস্ত্রের

শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল যা মানুষকে পরম শান্তিতে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা দান করেছিল। এভাবেই এতদঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতিতে, তাদের রক্তের কণিকায় ধর্ম এতটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে; সুতরাং ইউরোপের ঐ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত জীবনব্যবস্থা এখানে অচল। তবু যেহেতু ইংরেজরা তখন প্রভু, তাই তারা চাইল প্রভুর ধর্মই হবে দাসের ধর্ম। এ লক্ষ্যে তারা আধুনিক শিক্ষার নামে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা এখানে চালু করল যার মাধ্যমে তারা এ জাতির মধ্যেও ধর্মবিদ্বেষের প্রসার ঘটাতে চাইল। তারা তাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বারা এ জাতির মননে গেঁড়ে দিতে চাইল যে, ধর্ম হচ্ছে মিথ্যা, কূপমণ্ডূকতা, অন্ধকার, পশ্চাৎপদতা, বর্বরতা, সকল প্রকার উন্নতি-প্রগতির অন্তরায়, মুক্তচিন্তার প্রতিবন্ধক। স্বভাবতই তাদের এই ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে মানুষের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করল। তারা বুঝল সভ্য, আধুনিক, বিশ্বমানের মানুষ হতে হলে ধর্মকে বিসর্জন দিতে হবে। ঔপনিবেশিকদের এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তারা এদেশে একটি ধর্মবিদ্বেষী বস্তুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন শ্রেণি তৈরি করতে সক্ষম হল। সেই ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর থেকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে এই পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শ দাপটের সাথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে বহু বছর, কিন্তু ডানপন্থী শক্তিকে সদা-সর্বদা সমীহ করেই তাকে শাসনক্ষমতায় থাকতে হয়েছে। ডানপন্থী-বামপন্থী নিয়ে একটি টানাপড়েন চিরকালই ছিল, তবে হিন্দু, মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলে ইংরেজদের বহু সাধনার 'সেক্যুলারিজম' সম্প্রতি একেবারে হুমকির মুখে পড়ে গেছে। কথিত গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ও তার ধারক এই ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণির রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি ও অন্যায় তাদের থেকে মানুষকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটা এসেছে ভারতের বিগত ১৬ তম লোকসভা নির্বাচনে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে বড় ভোটাভুটির এই যুদ্ধে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি। দলের এই সাফল্যের পেছনে কংগ্রেসের বিগত ১০ বছর শাসনামলের ব্যর্থতা ও বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদির শাসনাধীন গুজরাটের দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নসহ আরো কিছু ইস্যুকে চিহ্নিত করা হলেও সবচেয়ে বড় কারণ নিঃসন্দেহে মোদি ও তার দলের হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তি। তিনি যেভাবেই হোক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটকে নিজের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষক ও কথাশিল্পী আবুল হাসনাত বিজেপির এই অভূতপূর্ব বিজয় সম্পর্কে লিখেছেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে শুরু করে বজরং পরিবার কী দুর্ধর্ষ প্রচারে, সংগ্রামে, আক্রমণাত্মক ভূমিকায় তথা হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার তুঙ্গ-তরঙ্গে দলটিকে স্থাপন করায় যে শক্তি ও ভিত জনগণের মনে ঠাঁই করে নিয়েছে তা-ই মোদির বিজয়কে অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরবটিকা পরিয়েছে।" (দৈনিক যায়যায়দিন, মে ২৮, ২০১৪)। এ বিজয়কে ভারতের ইতিহাসের এক বিপদসঙ্কুল অধ্যায়ের সূচনা (most sinister period since independence) হিসেবে বর্ণনা করেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ (Pankaj Mishra,

দাদাভাই নওরোজি, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধী থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত উপমহাদেশের কিংবদন্তী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যে দলটির ইতিহাস জড়িয়ে আছে সেই ১২৯ বছরের গরীয়ান রাজনীতিক দল কংগ্রেসের পক্ষে ডানপন্থী মোদির এক আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সেক্যুলার দলগুলোর জন্য গাঢ় লাল সংকেত প্রদর্শন করে।

The Guardian, Friday 16 May 2014). নরেন্দ্র মোদির সরকার যদি সফলভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় সক্ষম হন তবে দেশের সেক্যুলার রাজনীতিক দলগুলো স্বভাবতই অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যাবে। এমনই ইঙ্গিত দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদিপ নায়ার সম্প্রতি Whither Congress? শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন, "কোনো সন্দেহ নেই, মোদি ভারতের জাতীয় নেতায় পরিণত হচ্ছেন, আর বিজেপি জাতীয় দলে পরিণত হচ্ছে। এটা সত্য, মোদির হাতে ট্রাম্পকার্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, যার মূল সুর হচ্ছে সংকীর্ণতা (Parochialism)। সেক্যুলার শক্তিগুলো কোনো রকম গাঁইগুঁই না করেই আত্মসমর্পণ করছে (The secular forces are meekly surrendering.)।" ['Mainstream Weekly: October 24, 2014]।

দাদাভাই নওরোজি, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধী থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত উপমহাদেশের কিংবদন্তী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যে দলটির ইতিহাস জড়িয়ে আছে সেই ১২৯ বছরের গরীয়ান রাজনীতিক দল কংগ্রেসের পক্ষে ডানপন্থী মোদির এক আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সেক্যুলার দলগুলোর জন্য গাঢ় লাল সংকেত প্রদর্শন করে। আমাদের দেশেও গণতান্ত্রিকদের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি, ক্ষমতাবানদের খাই খাই ভাব ইত্যাদির কারণে আমজনতার কাছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মোহনীয় শব্দগুলোর আবেদন প্রবল সঙ্কটে পড়েছে, পশ্চিমাদের শেখানো শ্লোগানগুলো দিন দিন ভিত্তিহীন হয়ে পড়ছে। এ সুযোগটিকে কাজে লাগাচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী সেই শ্রেণিটি যারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে রাজনীতি করে, তারা বহুদিন বাদে প্রতিপক্ষের দুর্বল সময়ে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে নিতে চাইছে। এটা ইতিহাস যে, সাধারণ মানুষ কখনো এই সুযোগ সন্ধানীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরক্ষণেই আবার আলিঙ্গন করে নিয়েছে। তবে সময়ের ব্যবধানে জনতার উপর সুযোগ সন্ধানী শ্রেণিটির প্রভাব বাড়ছে, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এমতাবস্থায় বৃহত্তর জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য করলে কার্যত দাঙ্গা ও সংঘর্ষই বৃদ্ধি পাবে; শান্তি, সম্প্রীতি হ্রাস পাবে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর প্রেরিত যে জীবনব্যবস্থাগুলো দ্বারা মানুষ শান্তি পেয়েছে - এটা মিথ্যা নয়, সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসগুলো মানুষের হৃদয়ে বার বার নাড়া দেয়। তাছাড়া ধর্মের সঙ্গে পারলৌকিক অবিনশ্বর জীবনের শান্তি-অশান্তিও জড়িত। সর্বোপরি পাশ্চাত্য 'সভ্যতার' বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাগুলো মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই মানুষ স্রষ্টার বিধানের দিকে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু এ পথে পা বাড়ালেই বিভিন্ন ধরণের ধর্মব্যবসায়ীদের খপ্পরে তারা পড়ে ভুল পথে চালিত হয়। ধর্মজীবীরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে হাইজ্যাক করে জঙ্গি বানিয়ে দেয়, রাজনীতির মিছিলে ব্যবহার করে। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ এবং ভুল পথ এতদুভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে জানা এবং জাতিকে জানানো রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের ঈমানের উপরে কোনো আঘাত হানা যাবে না। সেটা বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের ঈমানের উপর আঘাত না হেনে বোঝাতে হবে যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই, এ বিষয়ে এ দীনের সমস্ত ফকিহগণ একমত। আকিদা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা। এই ধারণাটি আগে সঠিক করে নিতে হবে, তারপরে ঈমান ও আমলের প্রশ্ন। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ কী, এ বিষয়টি সম্পর্কে যদি মানুষের সঠিক আকিদা না থাকে, তাহলে এই কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে পা বাড়ানো বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা যে এ বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত ধারণা বা আকিদা জানতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ধর্মের নামে ব্যবসা, জেহাদের নামে সন্ত্রাস, হেকমতের নামে প্রতারণা, একামতে দীনের নামে অপরাজনীতি, সুন্নাতের নামে দাড়ি-টুপি-মেসওয়াক, ইবাদতের নামে আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মের নামে কুসংস্কার, ঈমানের নামে অন্ধবিশ্বাস, শরিয়তের নামে ফতোয়াবাজি চলতেই থাকবে। কাজেই ধর্মকে অস্বীকার নয়, খাটো করেও দেখা নয়, বরং এই বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করে মানবতার কল্যাণসাধন করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

রাজনীতিতে কালো ছায়া

পরিবর্তনের সময় এখনি

আতাহার হোসাইন

আবারো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সাংঘাতিক টালমাটাল রূপ ধারণ করেছে। ২০১২-১৩ সালের রাজনৈতিক হানাহানির পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখে একটি নিয়মরক্ষার নির্বাচনের মাধ্যমে সেই দুঃসহ পরিস্থিতি মাত্র একটি বছরের জন্য সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারিতে নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে ঘিরে দেশ আবারো পূর্বের মতই সেই অরাজক অবস্থায় ফিরে গেছে। ঠিক আগের মতই রাজপথে চলছে সংঘাত, সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ, মারা যাচ্ছে মানুষ। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ সময় পার করছে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। খবরের কাগজগুলো অতীতের মতই উপস্থাপন করে যাচ্ছে এসব রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে দৈনিক অর্থনীতিক ক্ষয়-ক্ষতি পরিমাণ। উঠে আসছে আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগে নিম্নমুখিতার ভয়ানক সব খবর।

সরকারবিরোধী ২০ দলীয় জোট ৫ই জানুয়ারিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' এবং সরকারি দল দিনটিকে 'গণতন্ত্র রক্ষা দিবস' আখ্যা দিয়ে পাল্টা-পাল্টি কর্মসূচি দিয়ে পথে নেমেছে। সমাবেশ করতে না পেরে বিরোধী পক্ষ চালিয়ে যাচ্ছে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই পরিস্থিতি খুব একটা নতুন নয়। পাকিস্তানি দুঃশাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে এদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে এদেশের লাখ লাখ মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করেছিল সেই উদ্দেশ্য আজও পূরণ হয় নি। জন্মের পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে শুরু হয় হানাহানি। '৭৫ সালে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপর সামরিক বাহিনীর ক্যু-পাল্টা ক্যু'য়ের মাধ্যমে অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে যেতে থাকে। এমনকি এদেশের মানুষের উপর চেপে বসে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। এরপর দেশে আসে সংসদীয় গণতন্ত্র। কিন্তু এ গণতন্ত্রও আমাদের মুক্তি দিতে পারে নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে নির্বাচন। কিন্তু এদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি বারের জন্যও বিতর্কমুক্ত একটি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারবে না। প্রতিটি নির্বাচনেই পরাজিত দল বিজিত দলের

বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ এনে সে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে সে নির্বাচনকে মেনে নিলেও তারা প্রতিপক্ষকে কখনোই শান্তিমত দেশ চালাতে দেয় নি। ক্ষমতা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামানোর জন্য সব সময়ই তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছে। তাই দেশের উন্নয়নে কোন সরকারই নিরুপদ্রুপভাবে কাজ করতে পারে নি। তাদের অর্ধেক মনোযোগ ব্যয় হয়েছে বিরোধীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটাও হয়েছে নামকাওয়াস্তে একটি নির্বাচন, যাকে ঐ নির্বাচনের আয়োজকরাও নিয়মরক্ষার নির্বাচন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিরোধীপক্ষ সেই নির্বাচনকে একতরফা ও অবৈধ আখ্যা দিয়ে এখন পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষমতাসীন ও বিরোধীরা এই খেলাটি ধারাবাহিকভাবে খেলে যাচ্ছেন। সামান্য কিছুদিন একটু স্তিমিত থাকলেও আবার শুরু হয় একই অবস্থা। কিন্তু এর বিকল্প কী তা আমাদের প্রশাসন কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর কারোরই জানা নেই। একবার একপক্ষ ক্ষমতায় বসে যা যা করে, পরবর্তীতে বিরোধী দল ক্ষমতায় বসে হুবহু তাই করে বেড়ায়। অপরদিকে ক্ষমতাসীনরাও বিরোধী দলে গিয়ে আগের বিরোধীদলের কার্যক্রমের 'কপি-পেস্ট' করে চলে। এই অবস্থা আমাদের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই, কিছু হলেই এখানে চলে দিনের পর দিন হরতাল, অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ। এগুলোর মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলোর এসব নাশকতা নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চালাচ্ছে ধরপাকড়, দমন-নিপীড়ন ও ঠুকে দিচ্ছে মামলা। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে কেউই এগিয়ে আসছে না।

কাজেই প্রশ্ন আসে, আমরা কি এভাবেই এদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করতে করতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাব? প্রশ্ন আসে, কেন আমাদের নিজেদের মধ্যে এই হানাহানি, কেন আমরা হাড্ডি-কংকালসার নিরীহ মানুষের ভাগ্য নিয়ে এভাবে কাড়াকাড়ি করছি! আমরা কি এই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে পারি না? আমাদেরতো রয়েছে এক সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ইতিহাস- ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। আমরা

সম্প্রতি বিএনপি-জামায়াত জোটের ডাকা লাগাতার অবরোধে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে ঝলসে যাওয়া খেটে খাওয়া মানুষগুলো এভাবেই হাসপাতালের বিছানায় জীবন-মৃত্যুর এক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে

কি পারি না পাশ্চাত্য সভ্যতার শিখিয়ে দেওয়া ফাঁকা বুলির তন্ত্র-মন্ত্র বাদ দিয়ে আমাদের চিরাচরিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের জন্য উপযুক্ত কোন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে? যাদের মধ্যে ন্যূনতম মানবতাবোধ আছে, ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ আছে, মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে, এ দেশের প্রতি মায়া-মমতা আছে তাদের উচিত জাতিকে বাঁচানোর জন্য কার্যকরী চিন্তা করা। আমরা জানি, এক শ্রেণির লোক গজিয়েছে, যারা কালো টাকার অকল্পনীয় মালিক হয়েছেন, কৃষক-শ্রমিক-জনতার রক্ত চুষে, ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই বিদেশে সেকেন্ড হোম তৈরি করা আছে, বিশেষ পাসপোর্টও রেডি আছে, তাদের না হয় কোনও অসুবিধা নেই। তারা বিপদ দেখলে যে কোনো সময় উড়াল দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের যাওয়ার জায়গা কোথায়? যতই বিপদ আসুক, ঝঞ্জা আসুক, তাদেরকে এদেশেই থাকতে হবে, এখানকার মাটির সাথেই একদিন আমাদেরকে মিশে যেতে হবে। সুতরাং একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে তাদেরকে সুন্দর ও শান্তিময় একটি দেশ উপহার দেওয়ার বিকল্প আছে কী?

সুতরাং দেশকে বাঁচাতে হলে, দেশকে উন্নতি ও স্থিতিশীলতা দান করতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি বসবাস করার মত সভ্য দেশ উপহার দিতে সরকার, বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষকে কয়েকটি বিষয় একান্তভাবেই ভালো করে মনে রাখা দরকার। প্রথমেই ক্ষমতাসীনদেরকে বুঝতে হবে যে, যেহেতু তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনীতি করতে চাচ্ছেন এবং নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলে প্রচার করছেন এবং এদেশের সংবিধানও যেহেতু গণতান্ত্রিক, সেহেতু বিরোধী মতকে এভাবে ক্রমাগত কোণঠাসা করে, রাষ্ট্রকে পুলিশি রাষ্ট্র বানিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। ক্রমাগত এভাবে বলপ্রয়োগের নীতি অব্যাহত রাখলে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ক্ষমতাসীনদের উপর থেকে সমর্থন ও ভালোবাসা উঠিয়ে নেবে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের কর্মসূচিকে অব্যাহতভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে বানচাল বা সীমিত করতে শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করলে তারাও পাল্টা বাধা দেবে- এটাই স্বাভাবিক। এতে করে সৃষ্টি হবে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিতে না পারলে সরকারকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে সরকারি আমলা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর। এতে তারাও সুযোগ বুঝে সরকারের উপর চড়াও হবে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তারা আদায় করে নেবে। অপরদিকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জয়-পরাজয় অনেকটা নির্ভর করে বৈদেশিক শক্তিগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। তাদের দেওয়া অনুদান কিংবা ঋণের উপর আমাদের অর্থনীতি, বাজেট কিংবা উন্নয়ন নির্ভর করে। দেশে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপের মুখে রাখা হলে সেইসব শক্তিগুলো আমাদের দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করার অজুহাত পেয়ে যাবে।

অন্যদিকে যারা বিরোধী পক্ষে রয়েছেন তাদেরকেও ভাবতে হবে তারা সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে গণতন্ত্রের নামে যে ধরনের সহিংস ঘটনার জন্ম দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ফেলছেন, তাতে মানুষ এক সময় আপনাদের উপরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এভাবে একদিকে সরকারের বলপ্রয়োগ আর বিরোধীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুধু সাধারণ মানুষের বিপদই বাড়িয়ে যাবে। ফলে সাধারণ মানুষ প্রচলিত এই ব্যবস্থা থেকে এক সময় মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে তাদেরকেও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই সমাজ আর মানুষের সমাজ নেই, এ সমাজে মানবিকতার কোন মূল্য নেই। এ সমাজ ব্যবস্থায় কোন একজন মানুষের নিরাপত্তা নেই, এখানে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতাহীন একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষিকাকেও চলার পথে ইটের আঘাতে মেরে ফেলা হচ্ছে, বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসতে গিয়ে বোমার আগুনে ঝলসে যাচ্ছেন মা, প্রতিপক্ষকে হামলা করে হাত- পা কেটে ফেলা হচ্ছে, জলজ্যান্ত মানুষকে গুম করে নাই করে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে এসব জাতিবিনাশী ও আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড করে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের এই অবস্থা যদি এভাবে চলতে থাকে তবে আমাদের দেশটাও একটা শ্মশানে পরিণত হতে খুব বেশি দেরি নেই। রাজনীতিকদের উপর ভরসা করে আমাদেরকে বসে থাকলে চলবে না। এই সিস্টেম, এই সংস্কৃতিকে উৎপাটন করে কোন একটি উত্তম ব্যবস্থা কায়েম করা এখন একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য সাধারণ মানুষকেই উপায় খুঁজে বের করতে হবে, এবং এই মুহূর্তেই।

পারস্পরিক এই অবিরাম কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির যে সংস্কৃতি আমাদের দেশে বিগত ৪৩ বছর ধরে চলছে, এর পেছনে প্রধান দু'টি ফ্যাক্টর হচ্ছে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও অপরাজনীতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে ধর্ম আল্লাহ পাঠিয়েছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অকল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলছেন, 'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ'। (সুরা হুমাযাহ ১)

মানবজাতিকে 'ধর্মহীন মুক্তমনা করার চেষ্টা কতটুকু সফল হলো?

রিয়াদুল হাসান

মুক্তবুদ্ধির চর্চা আসলে কী? বুদ্ধিকে কে বন্দী করে রেখেছে যে তাকে মুক্ত করার প্রয়োজন পড়লো? এর উত্তর সকলের জানা। যুগে যুগে ফতোয়ার চোখরাঙানি মানুষের স্বাধীন বিবেচনা শক্তিকে আবিষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যারা চিন্তাহীন নির্বোধ পশুতে পরিণত হয় নি তারাই সেই ধর্মীয় অন্ধত্বের বিরুদ্ধে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়েছেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা তাই মানবজাতির চিন্তার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আজকের এই প্রতারণার যুগে সবকিছুর সংজ্ঞা একরকম আর প্রয়োগ সম্পূর্ণ উল্টো রকম। এটা যুগের ধর্ম। দুধের মধ্যে বিষ, মানুষের মধ্যে শয়তান, গণতন্ত্রের মধ্যে ফ্যাসিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা। পৃথিবীতে অবৈধ বলে কিছু নেই, অবৈধ কেবল ধর্ম। তাইতো আল্লাহ-রসুলের নামে পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য রচনাকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বাক স্বাধীনতা বলে চালু করে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবাধ বিদ্বেষ আর মিথ্যা প্রপাগান্ডার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে কথিত মুক্তমনারা বলে "MUZZLE ME NOT" (আমাকে বলতে দাও)। ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের কথা বলার অধিকার দেওয়ার জন্য সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় পর্যায়ে হাক ডাক ফেলে দেন। কিন্তু অন্য বহুক্ষেত্রে তারা নীরব থাকেন। যাদের উদারতা দেখে মুক্তমনাদের আঁখি ফেরে না, সেই পশ্চিমা বিশ্বে মুক্তবুদ্ধির চর্চা কতটুকু হচ্ছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্পর্কে কুৎসামূলক ব্লগ বা পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য সৃষ্টি করে নয়, মাতাল অবস্থায় কিছু গালাগালি করায় ল্যুক অ্যাঞ্জেল নামের এক ব্রিটিশ তরুণকে চির জীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১০ এর সেপ্টেম্বরে। ঐ তরুণের পক্ষে মার্কিনি বুদ্ধিজীবীরা জনমত তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কিন্তু আল্লাহ-রসুলকে নিয়ে কুৎসা রচনার অধিকার

সংরক্ষণ করতে সবাই কী তৎপর! **আসলে এদেশীয় মুক্তমনারা কী বলতে চায়? তাদের সব কথার পেছনের কথাটি কী? সাদা ভাষায় তাদের মূল চাহিদা আপাতত অবাধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সুযোগ-সুবিধা; যেমন সমাজে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, ব্যভিচার শব্দটি ডিকশনারিতেও থাকবে না। যে কেউ যে কারও সঙ্গে (রক্তীয় সম্পর্কসহ) যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে, সমকামিতার অধিকার থাকবে, যে কেউ সর্বত্র নগ্ন থাকতে পারবে, মদ্যপানকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে কোনো কথাই তাদের অসহ্য**। প্রশ্ন হচ্ছে- তাদের এই স্বপ্নের সমাজ কত দূরে? ইতোমধ্যেই ইউরোপ, আমেরিকার অনেক দেশে মানুষের এ 'অধিকারগুলো' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আমাদের এখানে এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, কারণ মানুষের বুদ্ধি এখনও ধর্মের কারাগারে 'বন্দী'। জানা কথা, পশ্চিম জ্ঞানভিত্তিক, প্রাচ্য বিশ্বাসভিত্তিক। এ 'বন্দিদশা' থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই বর্তমানের তথাকথিত মুক্তমনারা শপথ নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে এবং হবে সেটা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু। কারণ কম্পাসের কাটা এখন আবার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় জাগরণের উত্তর যুগের দার্শনিকগণ

নাস্তিকতাও একপ্রকার ধর্মবিশ্বাস যার প্রতীক হচ্ছে স্রষ্টাকে তথা সব ধর্মকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করো।

যুক্তিবাদ (Rationalism), অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), আদর্শবাদ (Idealism) সহ বিভিন্ন দর্শন আবিষ্কার করলেন। এটা করতে হলো কারণ ভাববাদী দর্শন তথা ধর্মগুলো বহু আগেই মানবকল্যাণের উপযোগিতা হারিয়েছিল। আদ্যিকালের ধ্যানধারণা (ধর্ম) ঝেড়ে ফেলতে হলে বিকল্প ধ্যানধারণা দাঁড় না করালে চলবে কী করে? তাই শূন্যতা পূরণ করতে এবং যুগের চাহিদাই এসকল দার্শনিকদের সৃষ্টি করেছিল। এদের নামের লিস্টি ও কাজের তালিকা অনেক লম্বা, আমরা সেদিকে যাবো না। আমাদের বিষয় ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবজাতির জীবন পরিচালনার যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন সেটা কতটুকু পূরণ হলো। উপরোক্ত দার্শনিকদের মধ্যে কিছু আছেন রাজনীতিক দার্শনিক যাদের মতবাদ বিশ্বের ইতিহাস এবং মানুষের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়েছে। তাদের মধ্যে থমাস হবস, জ্যাক রুশো, স্পিনোজা, ইমানুয়েল কান্ট, ডেভিড হিউম, কার্ল মার্কস, হেগেলস, ফেডরিখ এঙ্গেলস, স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের নাম না করলেই নয়। যুগটা ছিল বাণিজ্যিক উপনিবেশ সৃষ্টি আর সাম্রাজ্য বিস্তারের। ইউরোপের দেশগুলো নতুন যুগশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে বণিকের বেশে দিকে দিকে দেশ দখলের অভিযান চালালো। যেখানে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল সেখানেই চেষ্টা করল তাদের নিজ দেশের রাষ্ট্রনীতি ও দর্শনকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে করে আধুনিক দাসদের মন-মগজ নিজেদের চিন্তার অনুকূলে থাকে। এজন্য তারা শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক ক্লাব, পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য অনুবাদ, বুদ্ধিজীবী ভাড়া করাসহ বহুপ্রকার পথ গ্রহণ করেছিল। আমাদের উপমহাদেশেও এ প্রক্রিয়া চলেছে। শিক্ষা বিস্তারের নামে ইতিহাস বিকৃতি, মানসিক দাস তৈরি, ধর্মহীনতার বিস্তার ঘটানোর এ সুবিশাল চক্রান্ত কী বিরাট কলেবরে সাধিত হয়েছিল তা যারা এ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন, বিস্ময়ে বিহ্বল হতে বাধ্য হবেন। আমাদেরকে দুধের বোতলে পুরে দু'শো বছর যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার ফল ভোগ না করে উপায় নেই। আমাদের সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি প্রায় পুরোটাই আল্লাহর অস্তিত্ব, পরকালীন জীবন, মালায়েকদের অস্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত, সন্দেহগ্রস্ত। আর যারা সে বিষ পুরোটাই খেয়েছে তারা ভাবছে ধর্মকে পুরোপুরি উৎখাত না করা পর্যন্ত মানুষের চিত্ত মুক্ত হবে না, ধর্মের প্রতি তাদের মনোভাব হিংসাত্মক। এরা নিজেদেরকে মানবতার অবতার এবং উচ্চস্তরের চিন্তানায়ক মনে করে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য আল্লাহ-রসুল-

কমুনিস্ট দেশগুলোয় বহুল প্রচলিত একটি পোস্টার। স্টিম ইঞ্জিনে করে এগিয়ে আসছে শিল্পবিপ্লবের কারিগরেরা। পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে বৃদ্ধ ধর্ম।

"কল্পনা করুন, কোনো ধর্ম নেই"- পেনসালভানিয়ার রাজধানী হ্যারিসবার্গের রাস্তায় এমন স্বপ্নময় বিলবোর্ড আজও দেখা যায়। বিকৃত ধর্মের আঘাতে জর্জরিত ও ক্লান্ত মানুষ এমন স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মাথায় ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা কি সমাধান?

মালায়েক, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এক কথায় মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হাসি-তামাশা করে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে গরু-ছাগলের অধম মনে করে। বিগত শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে ধর্মের বিরোধিতা করা হয়েছে নগ্নভাবে, আর এ শতাব্দীতে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধেই মুক্তবুদ্ধির কৃপাণ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রকে নাস্তিকতার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়, কারণ গত শতাব্দীতে সেভাবেই এর প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমি যতটুকু মার্কস পড়েছি, দেখতে পেয়েছি তার অবস্থান ছিল মূলত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, আর্থনীতিক অবিচারের বিরুদ্ধে, নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা তার মূল বাণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে তিনি তার মনোভাব একটি লাইনে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে তার মেধার প্রতি শ্রদ্ধা না এসে পারে না। তিনি বলেছিলেন, Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. (অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত প্রাণের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর মাঝে হৃদয়, আত্মাহীন পারিপার্শ্বিকতার মাঝে আত্মাস্বরূপ। মানুষের কাছে ধর্ম যেন আফিমের মত।" আফিম খেয়ে মানুষ জীবনযন্ত্রণা ভুলে থাকে, ধর্মও মানুষকে তেমনি জীবন যন্ত্রণা ভুলতে সাহায্য করে। মার্কস যে ধর্মটি সামনে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে তার এ উক্তি সর্বাংশে সত্য, আজও সেটা সত্যই আছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, মার্কস প্রকৃত ধর্ম দেখতে পান নি, পেয়েছেন সহস্র বছরের বিকৃত ধর্মের লাশ, যার দিকে তিনি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তিনি কি ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন, ধর্মকে পদদলিত করতে চেয়েছিলেন? আমার মনে হয় না। হয়তো তিনি নাস্তিক ছিলেন কিন্তু ধর্মের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না, এর ইতিবাচক দিকগুলোও তিনি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু তার সৃষ্ট মতবাদকে যখন যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হলো সেখানে স্রষ্টাকে নিয়ে কী নির্মম তামাশা করা হয়েছে সেটা ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। রসুলাল্লাহকে নিয়ে নয়, সরকারি উদ্যোগে স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হয়েছে যা বিলবোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কার্টুনগুলো আল্লাহকে প্রায়শই সাদা দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধরূপে চিত্রিত করা হয়েছে যাঁকে সবুট লাথি দিয়ে বিতাড়িত করার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করাও ঝুঁকিপূর্ণ। এতসব করেও মানুষকে সমাজতান্ত্রিকরা বা মুক্তবুদ্ধিজীবীরা নাস্তিক বানাতে পারে নি কেন? উল্টো আজ সমাজতন্ত্র ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেওয়া মতবাদ। নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে বাস্তব কিছুই জানে না। উল্টোদিকে ধর্ম উঠে এসেছে বিশ্বের প্রধান আলোচিত বিষয়ের তালিকায়। বর্তমানে গণমানুষের ধর্মীয় আবেগ রীতিমত মুক্তচিন্তাশীলদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই যুগ পৃথিবীর তাবত যুদ্ধে ধর্ম ছিল প্রধান ইস্যু, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ দেখে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে 'সভ্যতার ধ্বজাধারীদের' যারা কিনা ধর্মীয় স্বাধীনতার শ্লোগান দেয়। মুক্তচিন্তাবিদরা যে আদতে কত বড় গোঁড়াপন্থী তা কি তারা জানেন? মানুষ যখন ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বলেন যে, এটা মানুষের

বাক-স্বাধীনতা, কিন্তু যখন তারা স্রষ্টার কথা বলে তখন বলে মানুষ কূপমণ্ডূক। একাধারে নন্দিত ও নিন্দিত প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী হুমায়ূন আজাদ বলেছিলেন, **"এদেশের মুসলমান একসময় ছিলেন মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিল; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছেন। পৌত্রের ঔরসে জন্ম নিচ্ছে পিতামহ।"**

যে ধর্মের উত্থান দেখে হুমায়ূন আজাদ আতঙ্কিত, সেটা আতঙ্কিত হওয়ারই মত। কারণ সেটা ধর্ম নয়, ধর্মের উল্টোটা। তালেবানি শাসন, আই.এস. শাসন কি ইসলামের শাসন? মোটেও নয়। তারপরও কথা হচ্ছে, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ আবার ধর্মের দিকে যাচ্ছে, ধর্ম থেকে কেন তাদের ফিরিয়ে রাখা যাচ্ছে না? কারণ:

ক) প্রতিটি মানুষের মধ্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার আত্মা, রূহ আছে (সুরা হিজর ২৯)। এর শক্তিশালী প্রভাব মানুষের চিন্তা-চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকে। এজন্য যখনই তারা বিপদাপন্ন হয় তখন প্রতি নিঃশ্বাসে স্রষ্টার কাছেই আশ্রয় চায়। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট রকম উপাদান প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলো পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ আয়াত বা নিদর্শন বলেছেন, যার সামনে মানুষের মস্তক অবনত হয়। এগুলো দেখার পরও কেবল একটি শ্রেণির প্রচারণায় মানুষ নাস্তিকে পরিণত হবে না। আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণীসমূহ মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতাবর্জিত, নিতান্তই অর্বাচীন ও মূঢ়তাসুলভ পরিকল্পনা।

খ) অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের পানেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, The Last hour), আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বৈরিতা থাকবে না, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গ, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

গ) শান্তির আশায় ধর্মের পানে ছুটে চলা মানুষকে ফেরাতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হবে ধর্মের বিকল্প এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন যা তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারবে, একই সঙ্গে দেহ ও আত্মার প্রশান্তি বিধান করতে পারে। কিন্তু সত্যি বলতে কি সেটা মানুষ আজ পর্যন্ত করতে পারে নি এবং কোনো কালে পারবেও না। বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু সবই মাকাল ফল। শান্তির শ্বেতকপোত গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কারো হাতেই ধরা দেয় নি। ধরুন, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি কীভাবে মরতে চাও? গুলি খেয়ে না বিষ খেয়ে? বাঁচার কোনো পথ নেই, কেবল মরার জন্য দু'টো পথ। ঐ মানুষটিকে একটা না একটা পথ বেছে নিতেই হবে। মানুষের আবিষ্কৃত জীবনব্যবস্থাগুলোকে যত সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকা হোক না কেন তা হচ্ছে মানবজাতির সামনে মৃত্যুর বিকল্প পথ। জীবনের পথ একটাই; আর সেটা হলো ধর্ম অর্থাৎ স্রষ্টাপ্রদত্ত দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। বর্তমান স্রষ্টাবর্জিত জীবনদর্শন মানুষকে কেবল মনুষ্যত্বের অধঃপতন আর নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জীবন উপহার দিয়েছে। কাজেই মানুষ এখন জীবনরক্ষার আশায় ধর্মের দিকেই যেতে চাইবে, কেননা তাদের বস্তুত শান্তি দরকার। কিন্তু মরীচিকা যেমন তৃষিতকে তৃপ্ত করতে পারে না, কেবল আরো ক্লিষ্ট করে তেমনি প্রচলিত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলোও মানুষকে কেবল সুখস্বপ্নে বিভোর করে প্রতারিতই করে এবং করবে। সেগুলো আর মানুষের ধর্ম নয়, কল্যাণের ধর্ম নয়, সেগুলো পুরোহিত-আলেম, সুফি সম্রাট, রাজনীতিক স্বার্থান্বেষী, ডানপন্থী, রক্ষণশীল আর উগ্রপন্থী জঙ্গিদের ধর্ম। নজরুল লিখেছেন,

তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

এই ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে শান্তি দিতে চায় না, চাইলেও পারবে না। কারণ প্রথমত এদের পথ ভুল, দ্বিতীয়ত এরা তো কেবল ক্ষমতা ও স্বার্থের উপাসক। সমাজকে শান্তিময় করতে এখন একটাই করণীয়, ধর্মের ক্ষতিকর চর্চা এড়াতে ধর্মকেই বাদ দেওয়া চলবে না, সেটা সম্ভব হবে না, বরং মানুষের ঈমানকে, ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে, ধর্মকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। এটা করতে হলে সর্বপ্রথম সমাজকে এই সর্বপ্রকার ধর্মব্যবসায়ী (Religion monger) থেকে মুক্ত করতে হবে, তাদের জন্ম নিষিদ্ধ ও প্রাদুর্ভাব বন্ধ করতে হবে। এখনো সময় আছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজচিন্তক, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ, রাজনীতিক সকলকেই এখন বুঝতে হবে যে, ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা চাঁদের আলোয় কাপড় শুকানোর মত। বিগত পাঁচশত বছর এই স্বপ্ন দেখা হয়েছে, কিন্তু এখন জেগে ওঠার সময় হয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে।

পশ্চিমা দর্শনে বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্নাসিক তথাকথিত মুক্তমনারা স্রষ্টাকে জুজু ও ধর্মকে মানুষের রচনা মনে করেন, তারা ধর্মের নাম-নিশানাও মুছে ফেলতে চান, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যেও অনেকে এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেন যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রনায়কদের কোনো মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়া সাজে না, তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে চলে না, তাদেরকে বুঝতে হবে, এই তথাকথিত মুক্তমনারা যতই ধর্মবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা চালান না কেন, প্রথমত সেটা সত্য নয়, দ্বিতীয়ত দিনের শেষে মানুষ ধর্মের দিকেই ফিরে আসবে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় যে জনমত, মুক্তমনাদের ভাবধারা মিথ্যা এবং সেই জনমতের, সেন্টিমেন্টের বিপরীত। এ কথা বিগত শতাব্দীতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। কমুনিস্টবিরোধী যুক্তরাষ্ট্রও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাদের জাতীয় আদর্শবাক্য বা কলেমা হচ্ছে, In God we trust. তাছাড়া যাদেরকে অনুসরণ করে এই প্রচেষ্টা তারাও নিজেদের ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই প্রভাবিত, তাদের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সবকিছুর পেছনে ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। আগের তুলনায় হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ৭৪% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আজও স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' বলে বিতর্কিত হয়েছিলেন সত্য, তবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ধর্মই ছিল যুদ্ধের মূল অনুপ্রেরণা। ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন চালানোর স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে এখন সকলের উচিত হবে, ধর্মকে কীভাবে মানবতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় সে পথের অনুসন্ধান করা। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে যতদিন ফেলে রাখা হবে, ততদিনই নতুন নতুন জঙ্গি দল, সুফি সাধক, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলের আবির্ভাব হবে আর সন্ত্রাস চলবে, প্রতারণা চলবে, যুদ্ধ চলবে।

রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বিগত ৫০০ বছর ধরেই চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষকে যতই বলা হচ্ছে ডানদিকে যেয়ো না, লাভ হচ্ছে না। ধর্মহীন জীবনব্যবস্থাগুলোর থেকে মানবজাতি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সেই অভিজ্ঞতাই আবার মানুষকে ডানদিকে মুক্তি খোঁজার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, আর দলে দলে মানুষ গিয়ে পড়ছে ধর্মব্যবসায়ীদের খপ্পরে। ঠিক যেভাবে পতঙ্গ অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দেয়।

আকিদা বিহীন ঈমান অর্থহীন

এই দীনের সমস্ত আলেম ও ফকিহদের অভিমত হচ্ছে এই যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি এবং তাছাড়াও আরও হাজারো রকমের ইবাদতের মূলে হচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতই এই নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমানভিত্তিক সমস্ত ইবাদত অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী?

আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept। কোনো জিনিস দিয়ে কী হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কেউ আপনাকে একটি মটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মটর গাড়িটি ইসলাম- আল্লাহ মানবজাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদীস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদির আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার লাগানো হয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমনভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য যে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করা। কিংবা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনা, ক্যাসেটে সঙ্গীত শোনা। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ক্যাসেট বাজাবেন।

এই হলে আপনার আকিদার ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ক্যাসেট, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা

প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, ইমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে আকিদা সঠিক না হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং অন্যান্য ইবাদতও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের ইসলাম বলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকিদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃত হয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মতো হয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মতো আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদীস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে করি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, এই আকিদা ভুলের কারণে হাজারো ইবাদত করা সত্ত্বেও যেমন অন্যান্য জাতির কাছে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে তেমনি আখেরাতেও ঐ সমস্ত ফরজ, সুন্নত, নফল ইবাদতসহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ আকিদা বিহীন ঈমান অর্থহীন।

এই দীনে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই

আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসাভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ্য না করে পারবেন না যে- চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন। "তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা করো না?" এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্ধৃতির কোনো প্রয়োজন করে না। এখানে শুধু দু'একটির কথা বলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-ভাবনা, কারণ ও যুক্তির উপর আল্লাহ অতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বলছেন-"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝ না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলব্ধির প্রত্যেকটিকে প্রশ্ন করা হবে (কেয়ামতের দিনে) (কোর'আন- সুরা বনি ইসরাইল ৩৬)।" কোর'আনের এ আয়াতের কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ না করতে। অন্য বিষয় তো কথাই নেই, সেই মহান স্রষ্টা তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ আল্লাহ কারও ঈমানের মুখাপেক্ষী নন। তারপরও তিনি তাঁর একত্ব, তিনি যে এক, তাঁর কোনো অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ব) ও উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধরেছেন। বলছেন- "বল (হে মোহাম্মদ), মোশরেকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও সার্বভৌমত্বের অধিকারী (এলাহ) থাকত তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌঁছতে চেষ্টা করত (কোর'আন- সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বলছেন- "আল্লাহ কোনো সন্তান জন্ম দেন নি; এবং তাঁর সাথে আর অন্য কোনও সার্বভৌম (এলাহ) নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি করছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং অবশ্যই কতগুলি (এলাহ-সার্বভৌম হুকুমদাতা) অন্য কতকগুলির (এলাহ) উপর প্রাধান্য বিস্তার করত (কোর'আন- সুরা আল-মো'মেনুন ৯১)।" এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই ঐগুলো ব্যবহার করতে বলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোন কিছুই অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তার নিজের অস্তিত্ব ও একত্বের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, (একটু

পেছনেই যা উল্লেখ করে এলাম) তেমনি তাঁর রসুল (সা.) তাঁর ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যাপারেও বলছেন- 'আমার ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হলো যুক্তি।' এছাড়া কোর'আনময় আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে যুক্তি উত্থাপন করে গেছেন এবং বলেছেন এবং কারও সাধ্য থাকলে তা খণ্ডানোর আহ্বানও (Challenge) জানিয়েছেন। তিনি যে দীন মানবজাতিকে দান করেছেন তা গ্রহণ করে নিতে তিনি মানবজাতিকে জোর না করে তিনি তাঁর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন এবং তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন" (সুরা মূলক ১৪)।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাস কোনভাবেই স্বীকৃত নয়। ইসলামের অপর নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন যা স্বাভাবিকের উপর, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ বিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (সা.) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ (সা.)। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে উপস্থাপন করছি। ওহোদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বনবী (সা.) বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে এটা নাও।" ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.)! আমাকে দিন, আমি এর হক আদায় করব।" মহানবী (সা.) তাকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে নাও।" এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) লাফিয়ে এসে হাত বাড়ালেন- "আমি এর হক আদায় করব।" আল্লাহর রসুল (সা.) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দুজানা (রা.) বিশ্বনবী (সা.) সামনে এসে প্রশ্ন করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কী?" রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- 'এই তলোয়ারের হক হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।" আবু দু'জনা (রা.) বললেন- 'আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করব।" বিশ্বনবী (সা.) আবু দু'জনা (রা.) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও সীরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মাদ বিন এসহাক)। একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত- শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত উর্ধ্বে। ওমর (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এসেছিলেন আবেগে, স্বয়ং নবীর (সা.) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা। কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হলো যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন যে মহানবী (সা.) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দু'জানার (রা.) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হয়ে যান নি, প্রশ্ন করেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কী তা না জানলে কেমন করে তিনি তা আদায় করবেন? বিশ্বনবী (সা.) যা চাচ্ছিলেন আবু দুজানা (রা.) তাই করলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন- 'কোন মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা [এবনে ওমর (রা.) উল্লেখ করছেন যে ঐগুলো তিনি একে একে এমন বলতে লাগলেন যে, মনে হলো কোন সওয়াবের কথাই তিনি (সা.) বাদ রাখবেন না] ইত্যাদি সবই করল, কিন্তু কেয়ামতের দিন তার আকলের বেশি তাকে পুরস্কার দেয়া হবে না (এবনে ওমর (রা.) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (সা.) শব্দ ব্যবহার করেছেন আকল, যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি 'আক্কেল' বলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দুজানা (রা.) যেটা ব্যবহার করে নবীকে (সা.) প্রশ্ন করেছিলেন তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের দিনে মানুষের সওয়াবই শুধু আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ঐ সব কাজ বুঝে করেছে, নাকি গরু-বকরীর মতো না বুঝে করে গেছে, এবং সেই মতো পুরস্কার দেবেন, কিম্বা দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আক্কেলের মতো নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াব মনে করে করে গেলে কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না। এই হাদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন করলে এই রকম দাঁড়ায়- 'বিচারের দিনে পাক্কা নামাজীকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন- নামাজ কায়েম করেছিলে? মানুষটি জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামাজ পড়েছি। আল্লাহ বলবেন-ভাল! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হুকুম করেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- আমি হুকুম ঠিকই করেছি। কিন্তু কেন করেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাজের আমার কী দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাজের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামাজ পড়েছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না, তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (সা.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাজের কোন পুরস্কার জুটবে না। অর্থাৎ সকল আমলের পুরস্কার পেতে পূর্বশর্ত উদ্দেশ্য বোঝা। অন্ধভাবে শুধু বিশ্বাস করলে, আমল করলে কোনো আমলেরই পুরস্কার পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই।

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফল

ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলো সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অধিকার করার পর এরা যাতে আর ভবিষ্যতে কোনদিন তাদের ঐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিল। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা, কারণ শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক বিষয় যে এর মাধ্যমে মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করা যায়; চরিত্রবান মানুষও তৈরি করা যায় আবার দুশ্চরিত্র মানুষেও পরিণত করা যায়; কী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে সে কেমন মানুষ হবে। দখলকারী শক্তিগুলো অধিকৃত মুসলিম দেশগুলোতে তাদের শাসনকে মজবুত করার জন্য দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল। একটি হলো ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করল এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণির কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজা-রাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখল; সেখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনমন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের খ্রিষ্টান শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলোকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা ক্ষমতা দিয়ে যায় এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির উপর যারা চরিত্রে ও আত্মায় ব্রিটিশদের দাস। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে।

অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পদানত মুসলিম জাতিটাকে এমন একটা ইসলাম শিক্ষা দিল যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়, তারা কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে

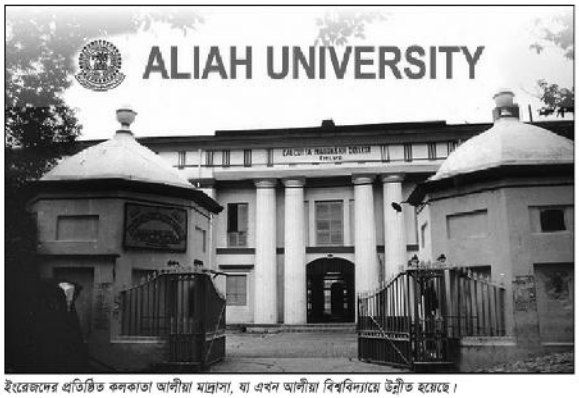

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা, যা এখন আলীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে।

যে ২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদে থেকে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ৭৬ বছর ধরে মুসলিম দাবিদার ছাত্রদেরকে বিকৃত ইসলাম শিখিয়েছেন তাদের তালিকা

১. এ.এইচ. স্প্রিঙ্গার এম.এ. (১৮৫০)
২. উইলিয়াম ন্যাসলীজ এল.এল.ডি (১৮৭০)
৩. জে. স্যাটক্লিফ এম.এ. (১৮৭৩)
৪. এইচ. এফ. ব্রকম্যান এম.এ. (১৮৭৩)
৫. এ. ই. গাফ এম.এ. (১৮৭৮)
৬. এ. এফ. আর হর্নেল (ই.ও.চ.ঐ.উ (১৮৮১)
৭. এইচ প্রথেরো এম.এ. (অস্থায়ী) (১৮৯০)
৮. এ. এফ. হর্নেল (১৮৯১)
৯. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯১)
১০. এ. এফ. হর্নেল (১৮৯২)
১১. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯৫)
১২. এ. এফ. হর্নেল (১৮৯৭)
১৩. এফ. জে. রো (১৮৯৮)
১৪. এফ. সি. হল (বি.এ.টি.এস.সি) (১৮৯৯)
১৫. স্যার অর্য়াল স্টেইন পি.এইচ.ডি (১৮৯৯)
১৬. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০০)
১৭. লে. কর্ণেল জি.এস.এ. রেঙ্কিং (১৯০০)
১৮. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০১)
১৯. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৩)
২০. এইচ. ই. স্টেপেল্টন (১৯০৩)
২১. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৪)
২২. এম. চীফম্যান (১৯০৭)
২৩. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৮)
২৪. এ. এইচ. হারলি এম.এ. (১৯১১)
২৫. মি. জে. এম. ব্রটামলি বি.এ (১৯২৩)
২৬. এ. এইচ. হার্লি এম.এ. (১৯২৫)

(সূত্র: ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা, বকশীবাজার এর ওয়েবসাইট)
http://www.dhkgovmalia.edu.bd/upload/Honor%20Board..pdf

Orientalist (প্রাচ্যবিদ) বলে একটা শিক্ষিত শ্রেণি ছিল ও আছে যারা ইসলামসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর গবেষণা করে থাকেন। এদের সাহায্য নিয়ে খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেবার জন্য তাদের মন মতো Syllabus (কি শিখানো হবে তার তালিকা) ও Curricullum (কি প্রক্রিয়ায় শেখানো হবে) তৈরি করে তা শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। আমাদের এ অঞ্চল তখন ব্রিটিশদের পদানত গোলাম। এই উপমহাদেশের ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সনে তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) দ্বারা তৈরি করা একটি বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা তৈরি করা এই ইসলামে প্রথমে-

(ক) কালেমার অর্থ বিকৃতি করা হলো; লা এলাহা এল্লাল্লাহ-র প্রকৃত অর্থ– 'আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা নেই' কে বদলিয়ে করা হলো– আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, যেটাকে আরবিতে ভাষান্তর করলে হয়– লা মা'বুদ এল্লাল্লাহ। এটা করা হলো এই জন্য যে, আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা, বিধানদাতা হিসাবে নিলে এ জাতিতো ব্রিটিশদের আদেশ মানবে না, মুসলিম থাকতে হলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। আর কালেমার মধ্যে এলাহ শব্দের অর্থ বদলিয়ে যদি উপাস্য বা মা'বুদ শেখানো যায় তবে এ জাতির লোকজন ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র উপাসনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি নানা উপাসনা করতে থাকবে এবং জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ প্রভুদের আদেশ পালন করতে থাকবে; তাদের অধিকার ও শাসন দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ বিকৃত ইসলামে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, আত্মার পরিচ্ছন্নতার জন্য নানারকম ঘষামাজা, আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হলো। কারণ এরা ঐ ইবাদত, উপাসনা নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকবে ব্রিটিশরা তত নিরাপদ হবে।

(খ) ব্রিটিশ শাসকরা এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার (Syllabus) মধ্যে প্রধানত বিতর্কিত বিষয়গুলোর প্রাধান্য দিল, যেগুলো অতি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল ইমামদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে, কোর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে। এগুলোকে প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় বলে Syllabus এর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো এই যে এই মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা যেন এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তর্কাতর্কি, এমনকি মারামারি

করতে থাকে, শাসকদের দিকে তাদের দৃষ্টি দেবার সময় না থাকে।

(গ) খ্রিষ্টানদের প্রাচ্যবিদদের তৈরি ঐ ইসলামে কোর'আনের গুরুত্ব একেবারে কমিয়ে দিয়ে সেখানে হাদিসের প্রবল প্রাধান্য দেয়া হলো। কারণ এই যে, কোর'আন চৌদ্দশ' বছর আগে যা ছিল আজও ঠিক তাই-ই আছে, এর একটা শব্দ দূরের কথা, একটা অক্ষরও কেউ বদলাতে বা বাদ দিতে পারে নাই, এর রক্ষার ব্যবস্থা আল্লাহ তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন (কোর'আন- সুরা হেজর ৯) কিন্তু হাদিস তা নয়। বহু হাদিস মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করেছে, খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমী ইত্যাদি খেলাফতের নামে আসলে রাজতন্ত্রের রাজারা তাদের যার যার সিংহাসন রক্ষার জন্য অজস্র মিথ্যা হাদিস তৈরি করে আল্লাহর রসুলের নামে চালিয়েছে। সুন্নীরা তাদের মতবাদের পক্ষে, শিয়ারা তাদের মতবাদের পক্ষে মিথ্যা হাদিস তৈরি করে নিয়েছে যার যার মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য। আরও বিভিন্নভাবে হাদিস বিকৃত হয়েছে। কোর'আনের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে হাদিসের ওপর এত জোর এবং গুরুত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য হলো বিতর্ক, বিভেদ শুধু জিইয়ে রাখা নয় ওটাকে শক্তিশালী করা।

(ঘ) তারপর তারা যে কাজটি করল তা সাংঘাতিক এবং যার ফল সুদূরপ্রসারী। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল তাতে মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে এসে তাদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার কোনো শিক্ষা দেয়া হলো না। অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ইত্যাদির কোনো কিছুই ঐ সব মাদ্রাসার সিলেবাসে (Syllabus) রাখা হলো না। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে, তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যেন ওখান থেকে বেরিয়ে যেয়ে তাদের শেখানো বিকৃত ইসলামটাকে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কোনো পথে উপার্জন করতে না পারে; কারণ ঐ মানুষগুলোর মধ্য থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে যদি কেউ বুঝতে পারে যে তাদের শিক্ষা দেয়া ঐ ইসলামটা প্রকৃতপক্ষে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া সত্য ইসলাম নয়, ওটা বিকৃত, তাহলেও যেন সে বাধ্য হয় ওটাকেই বিক্রি করে উপার্জন করতে, কারণ তাকে এমন আর কিছুই শিক্ষা দেয়া হয় নি যে কাজ করে সে টাকা পয়সা উপার্জন করে খেতে পারে। মূর্খ জনসাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য, ফতোয়া নেবার জন্য স্বভাবতই এদের কাছেই যেতে বাধ্য এবং তারা অবশ্যই ব্রিটিশ-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা ঐ প্রাণহীন, আত্মাহীন, বিতর্ক-সর্বস্ব ইসলামটাই তাদের শিক্ষা দেবে; এবং এ ভাবেই ঐ বিকৃত ইসলামই সর্বত্র গৃহীত হবে, চালু হবে। খ্রিষ্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে এই নীতিই কার্যকরী করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ (১০০%) সফল হয়েছে। ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে খ্রিষ্টান শাসকরা এর পরিচালনার ভার অর্পণ করল এ দেশীয় একজন মোল্লার হাতে যিনি খ্রিষ্টানদের বেঁধে দেওয়া শিক্ষাক্রম (Curricullum) অনুযায়ী মুসলমান ছাত্রদেরকে তাদেরই বেঁধে দেওয়া পাঠ্যসূচি (Syllabus) অর্থাৎ ইসলাম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু এ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের হাতে রাখল। তারা অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান চালু রাখল। অর্ধশতাব্দীর পর্যবেক্ষণের পর তারা যখন দেখল যে এ থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না, তখন ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ খ্রিষ্টান শাসকরা তাদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (Principal) পদটিও নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ডঃ স্প্রিংগার (Springer)। তারপর একাদিক্রমে ২৬ জন খ্রিষ্টান ৭৬ বৎসর (১৮৫০-১৯২৭) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে আসীন থেকে এই মুসলিম জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন।

খ্রিষ্টানদের গোলাম, দাস হবার আগেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তা না হলে তো আর গোলাম হতে হতো না। কিন্তু ওটার যা কিছু প্রাণ অবশিষ্ট ছিল খ্রিষ্টানদের তৈরি এই ইসলামে তা শেষ হয়ে গেল এবং এটার শুধু কংকাল ছাড়া আর কিছুই রইল না। দীর্ঘ ১৪৬ বছর এ বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curricullum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু করল [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]।

উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিষ্টানদের তৈরি বিকৃত ইসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে; শুধু ইদানীং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রি করে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হলে অন্য একটা কিছু করে খেতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত ইসলামটা ১৪৬ বৎসর ধরে শিক্ষা দিয়েছিল সেই বিকৃত, আত্মাহীন ইসলামটাকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি।

এক আল্লাহ, এক রসুল, এক দীন, এক কোর'আন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের এমন একটি বিষয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে বিষয়ে মতবিরোধ নেই। প্রতিটি বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল আর ফতোয়ার দুর্বোধ্য জাল সৃষ্টি করেছে এই জনগোষ্ঠীর ইমাম, আলেমগণ। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সমর্থনে আবার সৃষ্টি হয়েছে সমর্থকগোষ্ঠী বা অনুসারী। এইভাবে বিভক্ত হতে হতে জাতি আজ অসংখ্য মাযহাব, ফেরকা, দল, উপদল, তরিকায় বিভক্ত। এই দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে এতটাই শত্রুভাবাপন্ন যে একদল আরেক দলকে কাফের ফতোয়া দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ করেন, হত্যা করেন, অন্য দলের উপাসনাগৃহে হামলা করেন। এই যে ধর্মীয় কোন্দলে মুসলিম নামক জনগোষ্ঠীটি আজ লিপ্ত হয়ে আছে এর বীজ রপিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সময়। তাদের Divide and rule বা "ঐক্যহীন করে শাসন কর" নামক শাসননীতির একটি অংশ হিসাবে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসেই রেখে দিয়েছেন মাযহাব, ফেরকা নিয়ে, দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসলা মাসায়েল নিয়ে তর্ক করার শিক্ষা। এই বিকৃত ইসলাম যতদিন না এই জাতি ত্যাগ করবে এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ না করবে ততদিন তারা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মানবজাতিকে ধর্মহীন করার শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু শান্তিদায়ী

মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের অধ্যায়টি বিরাট। অতীতের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের সামনে এখন দুটো চশমা রয়েছে। একটি ধর্মহীন চশমা, আরেকটি ধর্মের চশমা।

ধর্মহীন চশমা বলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। সকল জীব ও জড়ও এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ উন্নত, কেউ অনুন্নত। এর জন্য দায়ী হচ্ছে অভিযোজনের ক্ষমতার তারতম্য। মানুষ হচ্ছে একটি বানরজাতীয় বিবর্তিত প্রাণী, যার আদিপিতা-পিতৃব্যরা গাছে থাকত, তাদের লেজ ছিল। তাদের থেকে সৃষ্ট নিগ্রয়েড, ককেশয়েড, মঙ্গলয়েড, অস্ট্রালয়েড ইত্যাদি।

আরেকটি চশমা বলছে, এই বিশ্বজগৎ একা একা সৃষ্টি হয় নি, এর একজন স্রষ্টা আছেন। যিনি এটি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করছেন। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি যার উদ্ভব জান্নাতে, যার আদিপিতা আদম (আ.), আদিমাতা হাওয়া (আ.)। তাদের থেকেই আজকের সকল হিন্দু, সকল বৌদ্ধ, সকল মুসলিম, সকল খ্রিষ্টান, আর সকলেই।

একটি চশমা দিয়ে তাকালে দেখি নূহ (আ.), এব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.) ইত্যাদি বহু উজ্জ্বল নাম। অন্য চশমায়

তাদেরকে দেখা যায় না, সেখানে আছে বস্তুবাদী দার্শনিকদের নাম। একটি চশমা বলছে, মানব ইতিহাস নবী-রসুলদের মাধ্যমে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামের ইতিহাস, ধর্মের দ্বারা মানবজাতির শান্তি পাওয়ার ইতিহাস। অন্য চশমা বলছে ধর্ম হচ্ছে অন্ধত্ব, কুসংস্কার, ধর্মের ইতিহাস বর্বরতার ন্যাক্কারজনক ইতিহাস।

এভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিচ্ছে উত্তর-উপনিবেশিক তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। এতে ধর্মকে রাখা হয়েছে নামে মাত্র। এস.এস.সি পর্যন্ত ধর্মের যেটুকু রাখা হয়েছে সেটুকুর উদ্দেশ্য নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান। কারণ এটা অস্বীকার করার মত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি যে, সকল ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা ধর্মেরই অবদান। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এমনভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বতে অস্বীকার করা হয়েছে। আর ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। যে ধর্ম সেখানে শেখানো হচ্ছে সেটাও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আলোচনা করে, সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। এটা হচ্ছে মানবজাতিকে ধর্মবিমুখ করে তোলার একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে নানা কারণে এ প্রক্রিয়া কিছুটা সফল হলেও প্রাচ্যে এটি কয়েক শতাব্দী পরও খাপ খাচ্ছে না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু গভীরে যেতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রথমত উদ্ভূত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে জর্জ জ্যাকব হোলিওক *(George Jacob Holyoake)* নামক এক ব্যক্তি সেকুলারিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। *Oxford Dictionary*-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ *(Secularism)*-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, *Belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc.* এ মতবাদের অনুসারী *(Secular)* সম্পর্কে বলা হয়েছে, *Not connected with spiritual or religious matter.*

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে *Enlightenment Movement*-এর সন্তান হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্ভব হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে এর অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন দর্শন আমদানি করলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই; ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্তরের ব্যাপার; অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে।

তাদের মূল বক্তব্য ছিল, যুক্তি (*logic*)-ই জীবন পরিচালনার ভিত্তি হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা বা ওহির জ্ঞান (*divine guidance*) এর কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপে এই আন্দোলনের সফলতার ফলে ধর্মহীন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, তাতে মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে গেল, ভোগবাদী হয়ে পড়ল, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। সর্বোপরি নীতিবোধের লোপ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ই এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেল।

নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিমানুষকে তাঁর আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ও পরিস্ফুটন ব্যতীত একটি সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষের মঙ্গলের কথা বলে, আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলে, ন্যায়-অন্যায় বোধের শিক্ষা দেয়। আর এসবই নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত যদিও তার আদি উৎসও বিভিন্ন ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষা তাতে ব্যক্তি নিজের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না। তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো। সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। তাই শিশুকাল থেকেই চরিত্রগঠনের এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

আমরা জানি যে, ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় হোক অনন্য এবং তারা তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতার কল্যাণকর ব্যবহার নিশ্চিত করুক। অথচ তাদেরকে আমরা সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শিক্ষাই দিয়ে থাকি। আমরা কি দেখছি না যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই

আজ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, চরিত্র বিকিয়ে টাকার মালিক হওয়ার প্রতিযোগিতা, মিথ্যা আর জালিয়াতির ছড়াছড়ি। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা। আর এর আয়োজন জাতি তথা রাষ্ট্রকেই করতে হবে সর্বজনীন প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কেননা, সকল পরিবারের পক্ষে সমভাবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক কাঠামোয় তৈরি করা সম্ভব নয়। পরিবারের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার কারণে যেন শিশু মানুষ হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য জাতিকে এ ভার নিতে হবে। এটা উপলব্ধি করে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর ***The Philosophy of the Modern Education*** গ্রন্থে অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।"

ইবাদত কী? কোন কাজ ইবাদত?

আল্লাহ বলেছেন যে তিনি মানুষকে ইবাদত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। তাহলে কী সেই ইবাদত? বর্তমানে আলেমরা ওয়াজে, নসিহতে মানুষকে কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি করার জন্য উপদেশ দেন, এগুলোকেই তারা ইবাদত ও ধর্মকর্ম বলে মনে করেন। নামাজ রোজা করা মানুষের প্রকৃত ইবাদত নয়। ইবাদত কথাটির অর্থ হচ্ছে যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করা। একটি ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে সময় দেখানোর জন্য, এটা করাই তার ইবাদত। সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে আলো, তাপ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য, এগুলো দেওয়াই তার ইবাদত। মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা আগে জানতে হবে। কারণ সেটা করাই তার ইবাদত। মানুষকে কি মসজিদে, মন্দিরে, গির্জা, প্যাগোডায় গিয়ে বসে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? না। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, এটা প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। পৃথিবী যখন অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, মসজিদ থেকে পর্যন্ত জুতা চুরি হয়, যে সমাজে চার বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিত হয় সেখানে এক শ্রেণির লোক মসজিদে গিয়ে পড়ে থাকেন, মনে করেন ইবাদত করছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন যে উপাসনা করছেন, মক্কায় গিয়ে মনে করেন যে ইবাদত করছেন। আসলে তাদের ইবাদত করা হচ্ছে না। মানুষের প্রকৃত ইবাদত হলো মানবতার কল্যাণে কাজ করা। আল্লাহ বলেছেন, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহরই প্রেমে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী (সুরা বাকারা ১৭৭)। সুতরাং মানুষ কী করলে শান্তিতে থাকবে, দরজা খুলে ঘুমাবে সেই লক্ষ্যে কাজ করাই হলো ইবাদত। যারা মানবতার কল্যাণে এই কাজগুলো করবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য দরকার হলো নামাজ, রোজা ইত্যাদি। যেমন একটি বাড়িতে খুঁটি দেওয়া হয় ছাদকে ধরে রাখার জন্য। যদি ছাদই না দেওয়া হয়, তাহলে শুধু খুঁটি গেঁড়ে কোনো লাভ নেই। নামাজ, রোজা হচ্ছে এই খুঁটির মতো। তেমনি যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করবে না, তাদের জন্য এই নামাজ-রোজা কোনো কাজে আসবে না। এগুলো তাদেরকে স্বর্গে বা জান্নাতে নিতে পারবে না। এর অর্থ কেউ যদি এই বুঝে থাকেন যে, আমি আপনাদের মসজিদে, মন্দিরে, প্যাগোডা, গীর্জায় যেতে নিষেধ করছি তাহলে আমি আপনাদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি বলছি প্রধান কাজ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা, কাজেই আসুন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখি, মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করি। মানবজীবন তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

যারা আইন-শৃঙ্খলার কাজে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত তারা যদি সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজ করে তবে তাদের এই কাজ আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত বলে গণ্য হবে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সকলকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করাই ইসলামের প্রধান কাজ। তাদেরকে বুঝতে হবে এই কাজ স্রষ্টার অতি প্রিয় কাজ। যুগে যুগে নবী-রসুলগণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

প্রচেষ্টা ও সংগ্রামহীন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না

বর্তমান মোসলেম নামধারী জনসংখ্যার একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। এর ধর্মীয় নেতারা, আলেম, মাশায়েখরা এই দোয়া চাওয়াকে বর্তমানে একটি আর্টে, শিল্পে পরিণত করে ফেলেছেন। লম্বা ফর্দ ধরে লম্বা সময় নিয়ে আল্লাহর কাছে এরা দোয়া করতে থাকেন। যেন এদের দোয়া মোতাবেক কাজ করার জন্য আল্লাহ অপেক্ষা করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে বিশেষ (Special) দোয়া ও মোনাজাতেরও ডাক দেওয়া হয় এবং তাতে এত লম্বা সময় ধরে মোনাজাত করা হয় যে হাত তুলে রাখতে রাখতে মানুষের হাত ব্যথা হয়ে যায়। অজ্ঞানতা ও বিকৃত আকীদার কারণে এরা ভুলে গেছেন যে কোন জিনিসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করে শুধু তাঁর কাছে চাইলেই তিনি তা দেন না, ওরকম দোয়া তাঁর কাছে পৌঁছে না। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী (দ:) তাঁর হাবিবকে যে কাজের ভার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সে কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে কি অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত অপমান-বিদ্রূপ-নির্যাতন-পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে- যুদ্ধ করতে হয়েছে- আহত হতে হয়েছে। তিনি ওসব না করে বসে বসে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মতো আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই তো পারতেন। আল্লাহর কাছে বিশ্বনবীর (দ:) দোয়া বড়, না আমাদের আলেম মাশায়েখদের দোয়াই বড়? দোয়াতেই যদি কাজ হতো তবে আল্লাহর কাছে যার দোয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কারো দোয়া নেই- সেই রসুল (দ:) ঐ অক্লান্ত প্রচেষ্টা (জেহাদ) না করে সারাজীবন ধরে শুধু দোয়াই করে গেলেন না কেন? তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে প্রচেষ্টা (আমল জেহাদ) ছাড়া দোয়ার কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (দ:) দোয়া যে করেন নি তা নয়; তিনি করেছেন, কিন্তু যথা সময়ে করেছেন অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর, সর্বরকম কোরবানির পর, জান বাজি রাখার পর, যখন আমলের আর কিছু বাকি নেই তখন। বদরের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন মোজাহেদ আসহাবগণ তাদের প্রাণ আল্লাহ ও রসুলের তরে কোরবানি করার জন্য তৈরি হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে, শুধু সেই সময় আল্লাহর হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তাঁর প্রভুর সাহায্য চেয়ে। ঐ দোয়ার পেছনে কি ছিল? ঐ দোয়ার পেছনে ছিল আল্লাহর নবীর (দ:) চৌদ্দ বছরের অক্লান্ত সাধনা, সীমাহীন কোরবানি, মাতৃভূমি ত্যাগ করে দেশত্যাগী হয়ে যাওয়া, পবিত্র দেহের রক্তপাত ও আরও বহু কিছু এবং শুধু তাঁর একার নয়। ঐ যে তিনশ' তের জন ওখানে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য নামাজের মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ছিলেন তাদেরও প্রত্যেকের পেছনে ছিল তাঁদের আদর্শকে, দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, দ্বিধাহীন কোরবানি, নির্মম নির্যাতন সহ্য করা। প্রচেষ্টার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষ সম্বল প্রাণটুকু দেবার জন্য তৈরি হয়ে ঐ দোয়া করেছিলেন মহানবী (দ:)। ঐ রকম দোয়া আল্লাহ শোনেন, কবুল করেন, যেমন করেছিলেন বদরে। কিন্তু প্রচেষ্টা নেই, বিন্দুমাত্র সংগ্রাম নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত তুলে দোয়া আছে অমন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। বদরের ঐ দোয়ার পর সকলে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অনেকে জান দিয়েছিলেন, আমাদের ধর্মীয় নেতারা দোয়ার পর পোলাও কোর্মা খেতে যান। ঐ দোয়া ও এই দোয়া আসমান জমিনের তফাৎ।

আল্লাহ বোলেছেন, "যে যতখানি চেষ্টা করবে তার বেশি তাকে দেয়া হবে না (কোর'আন, সুরা নজম, আয়াত-৩৯)।" মসজিদে, বিরাট বিরাট মাহফিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমায় যে দফাওয়ারী দোয়া করা হয়, যার মধ্যে মসজিদে আকসা উদ্ধার অবশ্যই থাকে- তাতে যারা দোয়া করেন তারা দোয়া শেষে দাওয়াত খেতে যান, আর যারা আমীন আমীন বলেন তারা যার যার ব্যবসা, কাজ, চাকরি ইত্যাদিতে ফিরে যান, কারোরই আর মসজিদে আকসার কথা মনে থাকে না। ওমন দোয়ায় বিপদ আছে, হাত ব্যথা করা ছাড়াও বড় বিপদ আছে, কারণ অমন

দোয়ায় আল্লাহর সাথে বিদ্রূপ করা হয়। তার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ। যে পড়াশোনাও করে না পরীক্ষাও দেয় না- সে যদি কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে যেয়ে ধর্ণা দেয় যে, আমার ডিগ্রী চাই, ডিগ্রী দিতে হবে তবে সেটা প্রিন্সিপালের সঙ্গে বিদ্রূপের মতই হবে। আমাদের দোয়া শিল্পীরা, আর্টিস্টরা লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমা, মাহফিলে দোয়া করেন- হে আল্লাহ! তুমি বায়তুল মোকাদ্দাস ইহুদিদের হাত থেকে উদ্ধার করে দাও এবং এ দোয়া করে যাচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম থেকে। ঐ সময়ে যখন দোয়া করা শুরু করেছিলেন তখন দোয়াকারীরা আজকের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও এখনকার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। যেরুসালেম ও মসজিদে আকসা তখন ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই মহা মোসলেমদের প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন দোয়া যতোই বেশি লোকের সমাবেশে এবং যতোই বেশি লম্বা সময় ধরে হতে লাগল ইহুদিদের হাতে আরবরা ততই বেশি মার খেতে লাগল আর ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও ততই বাড়তে লাগল। সম্প্রতি ইহুদিদের বর্বরোচিত হামলায় সহস্রাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হল, এর বিরুদ্ধে তারা ভগ্ন মসজিদে দু'হাত আসমানের দিকে তুলে দোওয়া করে যাচ্ছে আর মোসলেমবিশ্বও এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে শুধুই নিষ্ফল প্রার্থনায় রত।

আজ শুনি কোন জায়গায় নাকি ২০/২৫ লক্ষ মোসলেম একত্র হোয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দুনিয়ার মোসলেমের ঐক্য, উন্নতি ইত্যাদির সাথে তাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের মুক্তির জন্য দোয়া করে। আর আজ ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তন প্রথম অবস্থার চেয়ে তিন গুণ বড় এবং পূর্ণ যেরুসালেম শহর বায়তুল মোকাদ্দাসসহ মসজিদে আকসা তাদের দখলে চলে গেছে এবং মোসলেম জাতির ঐক্যের আরও অবনতি হয়েছে এবং বর্তমান খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের হাতে আরও অপমানজনক মার খাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় এরা এই বিরাট বিরাট মাহফিলে, এজতেমায়, মসজিদে, সম্মেলনে যা যা দোয়া করছেন, আল্লাহ তার ঠিক উল্টোটা করছেন। যত বেশি দোয়া হচ্ছে, ততো উল্টো ফল হচ্ছে। সবচেয়ে হাস্যকর হয় যখন এই অতি মোসলেমরা গৎ বাঁধা দোয়া করতে করতে 'ফানসুরনা আলাল কওমেল কাফেরিন'-এ আসেন। অর্থ হোচ্ছে "হে আল্লাহ! অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে (সংগ্রামে) আমাদের সাহায্য কর (সুরা বাকারা-২৮৬)।" আল্লাহর সাথে কি বিদ্রূপ। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লেশমাত্র নেই, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো করেই না, এমনিকি তাতে কোন সাহায্য পর্যন্তও করার চেষ্টা নেই, শুধু তাই নয় গায়রুল্লাহর, দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা জাতীয় জীবনে গ্রহণ করে নিজেরা যে শেরক ও কুফরীর মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছেন, সেখানে কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? এ শুধু হাস্যকর নয়, আল্লাহর সাথে বিদ্রূপও। তা না হলে দোয়ার উল্টো ফল হোচ্ছে কেন? যারা দোয়া করাকে আর্টে পরিণত কোরে, কর্মহীন, প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন, কোরবানিহীন, সংগ্রামহীন দোয়া করছেন তারা তাদের অজ্ঞতায় বুঝছেন না যে তারা তাদের ঐ দোয়ায় আল্লাহর ক্রোধ উদ্দীপ্ত করছেন, আর তাই দোয়ার ফল হচ্ছে উল্টো। তাই বলছি ঐ দোয়া করার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ।

ধর্মবিশ্বাসে জোর জবরদস্তি চলে না

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইসলামের বিরুদ্ধে বহুল উত্থাপিত একটি অভিযোগ হচ্ছে- ইসলাম বিকশিত হয়েছে তলোয়ারের জোরে। পশ্চিমা ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়া, লেখক, সাহিত্যিক এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী এই অভিযোগটিকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের প্রচারণায় অনেকে বিভ্রান্তও হচ্ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের প্রতি তাদের নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আসলেই কি ইসলাম প্রচারে জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান আছে? রসুলাল্লাহ ও তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী জাতির ইতিহাস কী বলে?

ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহর নীতিমালা আল কোর'আন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। এই দীনে কোনো জোর জবরদস্তির স্থান আল্লাহ রাখেন নি। তিনি বলেছেন- দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, কারণ সত্য থেকে মিথ্যা পৃথক হয়ে গেছে (সুরা বাকারা, ২৫৬)। অন্যত্র তিনি বলছেন- আল্লাহ কখনও কাউকেই তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না (সুরা বাকারা, ২৮৬)। কোর'আনে রসুলাল্লাহর যে দায়িত্ব আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করে দিলেন সেখানেও জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান রাখলেন না। কোর'আনে আল্লাহ রসুলকে বলছেন, তুমি তোমার মালিকের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ সহকারে উৎকৃষ্ট পন্থায় আহ্বান করো (সুরা নাহল, ১২৫)। তোমার কাজ হচ্ছে শুধু ঠিক

ঠিক মতো পৌঁছে দেওয়া (সুরা আন নুর, ৫৪; সুরা ইয়াসীন, ১৭)। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে- আল্লাহ কারও ধর্মবিশ্বাসের ওপর জোর-জবরদস্তি চালিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করছেন না। আল্লাহর নীতি হলো বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে, বলে-লিখে, বক্তৃতা করে ইত্যাদি যত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব মানুষের সামনে সত্যকে উপস্থাপন করা, হক্বের পথে আহ্বান করা, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিবে মানুষ। নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহর হুকুম অমান্য করার শামিল। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে, সত্য গ্রহণ বা বর্জন করা নিয়ে, আল্লাহর প্রতি, রসুলের প্রতি, কেতাবের প্রতি ঈমান আনা নিয়ে কোনো জবরদস্তি চলে না। সত্যকে দেখে যারা গ্রহণ করে নেবে তারা আলোকিত হবে, আর যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা অন্ধকারেই রয়ে যাবে। সত্যের বার্তাবাহকদের এ ক্ষেত্রে একটি মাত্রই কাজ, তা হচ্ছে- সত্য উপস্থাপন করা। এমনভাবে উপস্থাপন করা যার বিরোধিতা করার মতো বা ত্রুটি বের করার মতো কোনো সুযোগ না থাকে। যার সংস্পর্শে আসলেই মানুষ সত্যকে চিনতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু আজ ইসলামের নাম করে নিজেদের মনগড়া মতামতকে অন্যের বিশ্বাস ও মতের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটা ইসলাম নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়াও নয়।

জবরদস্তি বিভিন্ন প্রকারের আছে। যারা আজ ইসলামের সমালোচনা করেন, সেই পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ইতিহাসও জোর-জবরদস্তিমূলক ইতিহাস। দেশে দেশে গণতন্ত্রকে গেলানোর জন্য কত কিছুই না করা হচ্ছে। পৃথিবীতে সাড়ে সাতশ' কোটি মানুষের বসবাস। এই সাড়ে সাতশ' কোটি মানুষের রুচি-অভিরুচি, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, মননশীলতা, স্বভাব, পছন্দ-অপছন্দ এক নয়। একেক দেশের মানুষের চরিত্র একেক ধরনের। যে গণতন্ত্র ইউরোপের মানুষকে কিছুটা সাফল্যের ভাগী করতে পেরেছে সেই গণতন্ত্র এশিয়া বা আফ্রিকার মানুষকে সাফল্য নাও দিতে পারে। আবার মধ্যপ্রাচ্যে যে সিস্টেম ফলপ্রসূ সেটা আমেরিকার জনজীবনে হয়তো খাপ খাওয়ানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। বড় কথা হচ্ছে- এসব সিস্টেম মানবসৃষ্ট হওয়ায় এবং মানুষের শক্তি-ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় মানুষের তৈরি এসব সিস্টেম পৃথিবীর কোনো এক ক্ষুদ্র অংশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও সারা পৃথিবীতে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন আজ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা ও তার তল্পিবাহক মিডিয়া এই প্রাকৃতিক সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা যে কোনো উপায়ে সারা পৃথিবীতে কথিত গণতন্ত্র কায়েম করার প্রচেষ্টায় মত্ত। এটা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন জাতির বিশ্বাসপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করছে। যারা তাদের মতবাদ মানতে চায় না তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে, আর তাতেও ফল না হলে সামরিক হামলা করে দেশ দখল করছে, ঘর-বাড়ি, স্থাপনা ধ্বংস করছে। এখানে মানবতার কোনো বালাই নেই, জনগণের মতামতের কোনো জায়গা নেই। বৈধ-অবৈধের কোনো মানদণ্ড নেই। যার যে বিশ্বাসই থাকুক, যে জাতি যে মতবাদই পছন্দ করুক পশ্চিমা সভ্যতার কাছে তার কোনো দাম নেই। গণতন্ত্র সবাইকে মানতে হবে, সব জাতিতে কার্যকর করতে হবে এটাই যেন শেষ কথা। প্রশ্ন হচ্ছে- যারা 'তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে' বুলি আউড়িয়ে সত্যের উপর মিথ্যার প্রলেপ লাগাচ্ছে তারাই আবার কোন যুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাধীন দেশের মাটিতে বোমা ফেলছে?

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রসুল মক্কা জীবনে বহু জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষকে কোনো আঘাত করেন নি। দৃষ্টান্তহীন নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি তাঁর অনুসারীদের বলতেন- আসবের আসবের, সবর কর। তিনি কারও উপর ক্রুদ্ধ হন নি, অভিশাপ দেন নি, বরং ওই নির্যাতনকারী মানুষগুলোর পক্ষ নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করেছেন। এরপর যখন তারা ঈমান আনল, সত্যকে আলিঙ্গন করল তখন ওই মানুষগুলোই রসুলাল্লাহকে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে শুরু করল। ইতিহাস মতে রসুলাল্লাহ ও তাঁর জাতি যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছিল এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল সেটা কারও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল না। আসলে ওই যুদ্ধ-বিগ্রহগুলো হয়েছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। এই জাতির ইতিহাস পড়লে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, রসুলের হাতে গড়া ওই উম্মতে মোহাম্মদী জাতি কোনোদিন কোনোজাতির ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে নি। মুসলিম শাসনের অধীনে থেকে অন্যান্য ধর্মের মানুষ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করে গেছে। এমনকি তাদের কেউ কোনো অপরাধ করলে তার শাস্তি কোন ধর্মের বিধান থেকে দেওয়া হবে সেটাও বেছে নিয়েছে ওই অপরাধীই, উম্মতে মোহাম্মদী তা কার্যকর করেছে মাত্র। শুধু তাই নয়, ওই জাতি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কতটা সচেতন ছিল তা বোঝা যায় ওমর (রা.) এর একটি ঘটনা থেকে। ওমর (রা.) তখন আমিরুল মু'মিনিন, জাতির ইমাম বা নেতা। পবিত্র জেরুসালেম শহর মুজাহিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ঘুরে ঘুরে শহরের

দর্শনীয় বস্তুগুলো দেখার সময় যখন খ্রিষ্টানদের একটি অতি প্রসিদ্ধ গীর্জা দেখছিলেন তখন নামাযের সময় হওয়ায় তিনি গীর্জার বাইরে যেতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন সবেমাত্র মুসলিমদের অধিকারে এসেছে, তখনও কোন মসজিদ তৈরিই হয় নি, কাজেই নামায খোলা ময়দানেই পড়তে হতো। জেরুসালেমের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ সোফ্রোনিয়াস ওমরকে (রা:) অনুরোধ করলেন ঐ গীর্জার মধ্যেই তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামায পড়তে। ভদ্রভাবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোরে ওমর (রা:) গীর্জার বাইরে যেয়ে নামায পড়লেন। কারণ কি বোললেন তা লক্ষ্য করুন। বললেন- আমি যদি ঐ গীর্জার মধ্যে নামায পড়তাম তবে ভবিষ্যতে মুসলিমরা সম্ভবতঃ একে মসজিদে পরিণত করে ফেলতো।

আজকে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার ছাতা ধরে আছেন, গণতন্ত্রকেই উৎকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন, ইসলামকে মনে করেন প্রগতি বিরোধী-বাকস্বাধীনতা বিরোধী, তাদের প্রতি প্রশ্ন- প্রকৃত ইসলাম মানুষকে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিল, নিরাপত্তা দিয়েছিল আজকের কথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কি তার এক ভগ্নাংশও দিতে পেরেছে? ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন চিত্র বহন করছে। এটা ঠিক যে, কূপমণ্ডূক সংকীর্ণমনা ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে ইসলামের প্রকৃত রূপ আজ হারিয়ে গেছে। তাদের অতি বিশ্লেষণ, বাড়াবাড়ি আর সত্যকে অস্বীকার করার কারণে ইসলাম আজ আর আল্লাহ্ রসুলের সেই ইসলাম নেই। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের বিপরীতমুখী এই বিকৃত ইসলাম দেখে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করা নিশ্চয়ই বোকামি।

আমাদের কথা হচ্ছে, আল্লাহ মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে আমাদেরকে যে সত্যের জ্ঞান দান করেছেন সেটা শান্তিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অধিকার। এটা আমাদের নৈতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার এবং মানবাধিকার। প্রকৃত ইসলাম মানুষকে এ অধিকার প্রদান করেছিল, প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রও অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কাজেই যে কোনো অজুহাতে আমাদের এই সত্য প্রচারের অধিকার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা একদিকে যেমন সত্যের পরিপন্থী, তেমন আইনত অবৈধ।

মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই আল্লাহর অভিপ্রায়

আল্লাহ সৃষ্টি করলেন এই মহাবিশ্ব। কী বিশাল তাঁর এই সৃষ্টি! কী অসীম তার ব্যাপ্তি! সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তিনি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন নিজ হাতে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই পৃথিবী এবং মানবজাতি। তিনি পৃথিবীর মানুষসহ এখানকার সমস্ত উপাদান, জীববৈচিত্র সমস্তকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দিলেন তাঁর নিজ হাতে সৃষ্ট খলিফা আদমের উপর। উদ্দেশ্য, পরীক্ষা করে দেখা তাঁর সৃষ্ট খলিফা তাঁর দেয়া আমানত, তাঁর ফুঁকে দেয়া রুহ, তাঁর কাদেরিয়াহ অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি নিয়ে কী করে (সুরা আহযাব ৭২, সুরা হেজর ২৯)। আর পরীক্ষার জন্য যেহেতু বিরুদ্ধ শক্তি দরকার, সেহেতু তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করালেন ইবলিসকে।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির আগেই ইবলিস এই নতুন সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, 'এই নতুন সৃষ্টি তাঁর হুকুম মানবে না' (সুরা আরাফ ১৭)। তারা পৃথিবীতে গিয়ে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ, রক্তপাত এক কথায় ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অশান্তি করবে। আল্লাহ বললেন তারা যাতে তা না করে তার জন্য

তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে হাদী অর্থাৎ নবী-রসুলদের মাধ্যমে হেদায়াহ ও সহজ সরল দীন পাঠাবেন। তারা তা মেনে চললে ইবলিসের দাবি করা সেই অশান্তিতে পড়বে না, শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে। ইবলিসও আল্লাহর কাছ থেকে কিছু ক্ষমতা নিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে বলল যে, সে দেখিয়ে দিবে তার কথাই সত্য, অর্থাৎ তার দাবি মোতাবেক মানুষ অশান্তি করবেই।

সংক্ষেপে এরপরের ঘটনা এই রূপ: আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে জান্নাতে বসবাস করার অনুমতি দিলেন। সেখানে প্রথমবারের মতো আদমকে দিয়ে ইবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করাতে সক্ষম হয়। আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাকে এবং তার স্ত্রীকে পৃথিবীতে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে আদম (আ.) বংশবিস্তার করতে লাগলেন এবং আল্লাহর পাঠান হুকুম অনুযায়ী জীবন ধারণ করতে থাকেন। ক্রমে আদম সন্তানগণ বৃদ্ধি পেয়ে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা মোতাবেক প্রত্যেক জনপদে নবী-রসুল পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবন বিধান দেওয়া অব্যাহত রাখলেন। এদিকে ইবলিসও বসে ছিল না। সে মানুষকে দিয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করাতে থাকল। মানবজাতি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ভৌগোলিক পরিবেশ, তাপমাত্রা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তাদের গায়ের রং, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য এসে গেল। তারা পরস্পর বিভিন্ন গোত্রে জাতিতে রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত আল্লাহ বিচ্ছিন্ন সকল জনগোষ্ঠীর জন্য নবী-রসুল পাঠানো অব্যাহত রাখলেন। নবী রসুলদের আনীত দীন দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলে কিছু দিন পরেই তাদের অনুসারীরা শয়তানের প্ররোচনায় ঐ দীন আবার বিকৃত করে ফেলেছে, তখন আল্লাহ আবার আরেকজন নবী-রসুল-অবতার প্রেরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে, যোগাযোগে এমন একটা পর্যায়ে চলে এল, তখন আল্লাহ পুরো মানবজাতিকে আবার এক বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মানবজাতিকে নিয়ে আল্লাহর চূড়ান্ত অভিপ্রায়।

পূর্ববর্তী দীনসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আল্লাহ তাঁর কেতাবগুলোতে শাস্তির দিক দিয়ে মদ্যপান, ব্যভিচার, জেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখেছেন, কিন্তু শেষ কেতাবে দেখা যাবে ঐক্য নষ্ট করার শাস্তি সর্বোচ্চ। এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। ঐক্য নষ্ট করা মোনাফেকী ও কুফর এবং তা করলে সরাসরি দীন থেকে বহিষ্কার (আব্দালাহ বিন আমর (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত)। আল্লাহর রসুল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা করো, সে যেই হোক না কেন (হাদিস, আরফাজা (রা.) থেকে মুসলিম)।

আল্লাহ তাঁর অভিপ্রায়কে পূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে সমস্ত মানবজাতির জন্য নাজেলকৃত পূর্বের সকল বিধানকে রদ করে তাঁর সর্বশেষ রসুলের মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা পাঠালেন। অন্য সকল নবী-রসুলদের থেকে এই শেষ রসুলের পার্থক্য হলো- এবারে তিনি আর কোন নির্দিষ্ট জনপদের জন্য প্রেরিত নন, তাঁর কর্মক্ষেত্র সারা দুনিয়া। দ্বিতীয়ত, এবারে তাঁর আনীত দীন পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কাল অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আল্লাহর প্রেরিত পূর্বের কেতাবগুলোর সংরক্ষণভার এর আগে আল্লাহ নিজ হাতে গ্রহণ করেন নি। আর এবারের শেষ সংস্করণ আল্লাহর কেতাবের রক্ষাভার নিলেন স্বয়ং তিনি নিজে।

যেহেতু শেষ রসুলের দায়িত্ব সারা দুনিয়ার অন্যায় অশান্তি দূর করা, এবং এই কাজ একার দ্বারা সম্ভব নয়, সেহেতু তাঁকে এমন একটি জাতি তৈরি করতে হয়েছে যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী, যারা তাঁর অবর্তমানেও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন তাঁর উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাঁকে যে উপাধি দিয়েছেন, রহমাতাল্লেল আলামিন-সমস্ত দুনিয়ার উপর রহমতস্বরূপ তাও পূর্ণ হবে না। ইতিহাস সাক্ষী তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁর সৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেলেন ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের উপর এই দীনের বাস্তবায়ন করে গেলেন। যেহেতু বাকি দুনিয়ায় এখনো দীন কায়েম হয় নি এবং যতটুকুতে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাও আজ পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জাল দখল করে সারা দুনিয়ায় তার হুকুম কায়েম করে রেখেছে, তাই আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করতে গেলে আজ সারা দুনিয়াকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। যেহেতু আল্লাহর অভিপ্রায় হয়েছে এবং আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন সেহেতু তা হবেই হবে। প্রশ্ন হলো কিভাবে? রসুলাল্লাহর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী পৃথিবীতে আর বর্তমানে নেই। তাহলে এই কাজ এখন করবে কে?

এই কাজ সোজা নয়। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত, হাজার হাজার ভাষা, সাদা-কালোর ভেদাভেদ, শত শত ভৌগোলিক রাষ্ট্র, হাজারো ধর্মীয় মাজহাব, ফেরকা, তরিকা আর রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা মানবজাতি বিভক্ত হয়ে আছে। এখন তাদেরকে একজাতিতে পরিণত করা, একজন মাত্র নেতার হুকুমে পরিচালিত

করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। যেখানে পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত, যাকে মাত্র আজ থেকে পাঁচশত বছর আগেও মানুষ জানত না সেখানে কী আছে, ধারণা করত দেও-দানবের বাস, সেখানেও আজ মানুষের বসবাস। মানুষ আজ পৃথিবীর সর্বত্র গমন করছে, সর্বত্র বসবাস করছে। এই সমস্ত মানুষকে তাদের চিন্তা চেতনার ভিন্নতা, আচার আচরণ, ভাষার ভিন্নতা, মন-মানসিকতার তফাৎ, গোত্র, বর্ণের ব্যবধান, সমস্তকিছু ঘুচিয়ে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করা, একজন এমামের, নেতার হুকুমের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব দু'টি মাত্র উপায়ে। প্রথমত, হয় এমন একজন মানুষ আসবেন যিনি একটি মাত্র ফুঁ দিয়ে অলৌকিকভাবে এই কাজ করে ফেলবেন, বা তার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত অলৌকিকভাবে ঐ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অথবা তাঁকে ঐ কাজটি মানুষের মাধ্যমেই করতে হবে। অর্থাৎ এমন একটা শক্তিশালী জাতি থাকবে যারা তাদের নেতা যা চান তা যতই কঠিন হোক হুকুমের সাথে সাথে তারা বাস্তবায়ন করে ফেলবেন। তাদের সামনে অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না। হিমালয়ের মতো বাধা তাদের সামনে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এছাড়া তৃতীয় কোন উপায় নেই।

এবার দেখা যাক সম্ভাব্যতার বিচারে প্রথম উপায়টির উপযুক্ততা কতটুকু। ফুঁ দিয়ে বিরাট একটি কাজ বাস্তবায়ন করে ফেলাই যদি উপায় হতো তবে এর প্রথম হকদার হতেন আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল নিজে। কারণ, সমস্ত নবী রসুলদের তিনি নেতা, সমস্ত মানবজাতিকে শাফায়াত করার একমাত্র অধিকারী যিনি, যাঁর সম্মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ মাকামে মাহমুদায়, এবং দুনিয়াময় দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁরই উপর। তাঁর পরে যারা এই দায়িত্ব পালন করবে তারা শুধু তাঁর অনুসারী উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং মহানবীর চাইতে কে বেশী হকদার ফুঁ এর মাধ্যমে ঐ কাজ সম্পাদন করার? তিনি কি তাঁর দায়িত্ব ফুঁ দিয়ে পালন করতে পেরেছিলেন?

ইতিহাস তা বলে না। ইতিহাস বলে অবর্ণনীয় নির্যাতন, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রুপ সহ্য করে তিনি অটল পর্বতের মতো চালিয়ে গেছেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূরণের সংগ্রাম। প্রাণপ্রিয় সঙ্গী সাথীদের সীমাহীন নির্যাতিত হতে দেখেছেন তিনি, নিহত হতে দেখেছেন, তাদের বুকফাটা আর্তি দেখেও কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁর আত্মা। সর্বশেষ ওহুদের যুদ্ধে নিজের প্রাণের উপর হুমকি এল, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেন তিনি, দু'টো দাঁত শহীদ হলো, মাথায় শিরস্ত্রাণ ঢুকে তিনি রক্তাক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ফুঁ দিয়েই যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো তবে কেন তিনি এত নির্যাতন মেনে নিলেন? তিনি কি পারতেন না ফুঁ এর মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করে দিতে? তাঁকে জাগতিক পদ্ধতিতেই, প্রাকৃতিক নিয়ম মোতাবেকই মোকাবেলা করতে হয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতার। আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়, সবচাইতে সম্মানিত রসুলকে যদি ফুঁ এর পরিবর্তে প্রাকৃতিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে আর কে আছেন এত পবিত্র, এত পূণ্যবান, এত সম্মানিত, এত মর্যাদাবান যিনি ফুঁ দিয়ে জীবন সম্পদ কোরবানি না করে, রক্ত-ঘাম না ঝরিয়ে দাজ্জালকে ধ্বংস করে পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিবেন? সুতরাং প্রথম সম্ভাবনাটি আমরা বাদ দিতে পারি।

দ্বিতীয় পথ রইল প্রাকৃতিকভাবে সত্যিকার মোকাবেলায় দাজ্জালের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করে আল্লাহর রসুলের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আগেই বলেছি এ কাজ অত সোজা নয়। কিন্তু যতই কঠিন হোক কাউকে না কাউকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ করবেনই, মানবজাতিকে একটি দীনের আওতায় আনবেনই। তাই যিনি একাজ সম্পন্ন করবেন অবশ্যই তাঁর ঠিক ঐ রকম ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্যের সমন্বয়ে বজ্রশক্তি সম্পন্ন একদল অনুসারী থাকতে হবে যেমন ছিলেন আসহাবে রসুলগণ। তাদেরকে এমন হতে হবে যে তাদের নেতা, ইমাম যা বলবেন তা যতই কঠিন হোক তারা সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবেন। তাদের সামনে অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না। এমন একটি বজ্রশক্তিসম্পন্ন জাতি ছাড়া পৃথিবীর বুকে ঐ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। ঐ জাতির কাজ হবে একটাই, আর তা হচ্ছে শুধুমাত্র আদেশ শোনা আর পালন করা। আদেশ পালনের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রশ্ন করবে না, শর্ত আরোপ করবে না, দ্বিধা করবে না, কালক্ষেপণ করবে না। তাদের গুণ হবে ঐ একটাই। তারা পণ্ডিত হোক অথবা বোকা হোক, মহাশিক্ষিত হোক অথবা একেবারে নিরক্ষর হোক, ঐ একটা গুণ ছাড়া এ দুনিয়া বিজয় সম্ভব নয়। মানবজাতির ইতিহাসে বোধ হয় এ এক মহা অলৌকিক ঘটনা হবে, মো'জেজা হবে যে একজন মানুষ যিনি এক প্রচণ্ড বজ্রশক্তিধর জাতির ইমাম, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে যা চাইবেন তা হবে, অর্থাৎ কার্যকরী হবে। এই যে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ হয়ে যাওয়া অর্থ যে এক মুহূর্তের মধ্যে হবে তা নয়, তবে সেই কাজ হবে। সেই কাজ তাঁর বজ্রশক্তিধর জাতি সম্পাদন করে ফেলবে। এদের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে আল্লাহর অভিপ্রায়, সমগ্র মানবজাতি শুরুতে যেমন ছিল একটি পরিবারভুক্ত আবার তারা একই পরিবারভুক্ত হবে। সে সময় এনশা'আল্লাহ অতি সন্নিকটে। মানবজাতিকে যদি সত্য ও ন্যায়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তবেই পৃথিবীতে বিরাজমান সকল অন্যায় অবিচার নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আর এটাই আল্লাহর চাওয়া, মানবজাতি যেন শান্তিতে থাকে।

এক নজরে হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা:
মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ পবিত্র শবে বরাতে টাঙ্গাইলের করটিয়ার বিখ্যাত পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে তিনি প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দা গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী; করটিয়া, টাঙ্গাইল।

উদ্দেশ্য: সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন যার মূল কাজই হলো মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মানবজাতির অশান্তির মূল কারণ দাজ্জালকে প্রতিহত করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কাঠামো: এমাম-আমীর-সদস্য
(সদস্যদেরকে মোজাহেদ-মোজাহেদা বলা হয়ে থাকে)

বর্তমান আনুগত্যের ধারাবাহিকতা:
হেযবুত তওহীদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্বয়ং, তিনিই একে গত ১৯ বছর ধরে পরিচালনা করে আসছেন। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে মাননীয় এমামুয্‌যামানকে এ যুগের নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর থেকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানাস্থ পোরকরা গ্রামের নুরুল হক-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান, যামানার এমামের আদর্শের উত্তরাধিকার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। তাঁর জন্ম ১৯৭২ সনে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসএস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য:

☐ মানবজাতির বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্রষ্টার বিধান। মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, মানুষের জীবন সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের তৈরি এই বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র এ সমস্যাগুলোর সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান জীবনব্যবস্থা (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

☐ বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত ইসলাম যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলামের ধারক।

☐ ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোন বিনিময় চলে না। বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে।

☐ সহজ সরল সেরাতুল মোস্তাকীম দীনুল হক, ইসলামকে পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ, মোফাস্‌সেরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বহু মতের সৃষ্টি করেছে। ফলে একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা, মাজহাব, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে নিস্তেজ, নিস্প্রাণ করে দিয়েছে। ফলে একদা অর্ধ-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল যোদ্ধা জাতিটি আজ হাজার হাজার আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির উপাসনাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ইসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।

☐ ব্রিটিশরা এই জাতিকে পদানত করার পর এরা যেন কোনদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এজন্য একটি শয়তানি ফন্দি আঁটে। তারা এ জাতির মানুষের মন ও মগজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'টি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে, যথা: মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। তাদের অধিকৃত সকল উপনিবেশেই তারা মুসলমানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার নাম করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে তারা নিজেদের মনগড়া একটি বিকৃত-বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দেয়। মাদ্রাসাগুলোর

অধ্যক্ষপদ তারা নিজেদের হাতে রেখে দীর্ঘ ১৪৬ বছর এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাদের তৈরি 'ইসলাম' শিক্ষা দিয়েছে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রী করে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ খ্রিষ্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে এই একই নীতি কার্যকর করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হয়েছে।

☐ আল্লাহর শেষ রসুল আখেরি যামানায় যে একচক্ষুবিশিষ্ট দানব দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যাকে ঈসা (আ.) এন্টি ক্রাইস্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন, মাননীয় এমামুয্‌যামান সেই দাজ্জালকে হাদিস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতি সেই দাজ্জালের তৈরি জীবনবিধান মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় পড়ে আছে। পরিণামে তারা একদিকে যান্ত্রিক প্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও মানুষ হিসাবে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। সমগ্র মানবজাতি ঘোর অশান্তি, অন্যায়, অবিচারের মধ্যে ডুবে আছে। দাজ্জালের হাত থেকে পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আল্লাহর রসুল বলেছেন যে, যারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করবে তারা বদর ও ওহুদ দুই যুদ্ধের শহীদের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে (আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। হেযবুত তওহীদের যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদেরকেও আল্লাহ দুই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। যার প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি বিরাট মো'জেজা হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। তা হলো: এই দাজ্জাল প্রতিরোধকারীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের দেহ শক্ত (রাইগরমর্টিস) ও শীতল হয়ে যায় না। জীবিত মানুষের ন্যায় নরম ও স্বাভাবিক থাকে।

মূলনীতি:

☐ হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।

☐ হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

☐ হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইন ভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

☐ যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

☐ হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য কোন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

☐ কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, বৈধ উপায়ে রেযেক হাসিলের চেষ্টা করবে।

কর্মসূচি:

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ যে কর্মসূচি তাঁর শেষ রসুলকে দান করেছিলেন, যে কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহর রসুল এবং তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী অনুসরণ করেছিলেন সেই পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলছেন– এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ করে আমি চলে যাচ্ছি। সেগুলো হলো:

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।
(২) (নেতার আদেশ) শোন।
(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।
(৪) হেযরত (অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ) করো।
(৫) (এই দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো। এখানে জেহাদ অর্থ: সর্বাত্মক চেষ্টা, প্রচেষ্টা।

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

প্রশিক্ষণ:

মানবতার মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় চরিত্রবল, আত্মিক শক্তি, সবর,

লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা (হানিফ)। সেই চরিত্র হতে হবে প্রধানত উপরোক্ত পাঁচ দফা ভিত্তিক অর্থাৎ তাদেরকে হতে হবে ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মত সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার প্রতি প্রকৃতির মত আনুগত্যশীল, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক, কঠোর, প্রতিবাদী, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী ও সংগ্রামী। এই চরিত্র অর্জনের জন্য হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে সালাহ কায়েম করা। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সালাহ (বা নামাজ) চালু আছে সেটা আল্লাহ এবং রসুল প্রদত্ত সঠিক নিয়ম মেনে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে করা হয় না। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সালাতের সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া দান করেছেন। সালাতের বাইরে হেযবুত তওহীদ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শরীরচর্চামূলক খেলাকে (যেমন কাবাডি, ফুটবল, সাঁতার) উৎসাহিত করে থাকে।

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান:

- ☐ তওহীদ প্রকাশন
- ☐ তওহীদ কাবাডি দল
- ☐ দৈনিক নিউজ
- ☐ দৈনিক বজ্রশক্তি
- ☐ ইলদ্রিম মিডিয়া
- ☐ বাংলাদেশের পত্র ডট কম

(অনলাইন পত্রিকা)

- ☐ jatiyatv.com (অনলাইন)
- ☐ ওয়েবসাইট:

www.hizbuttawheed.com

বৃহত্তম মাইলফলক:

২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ এক মহান মোজেজা সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথা: হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর এমাম আল্লাহর মনোনীত হক এমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কর্মপ্রক্রিয়া

হেযবুত তওহীদ রাষ্ট্রীয় আইনকে পূর্ণরূপে মান্য করে গত ১৯ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। মানবজাতিকে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করার জন্য হেযবুত তওহীদ মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য ও লেখা সম্বলিত হ্যান্ডবিল, বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র ইত্যাদি সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, রাস্তাঘাটে এই প্রকাশনা সামগ্রীগুলো বিক্রয়, বই মেলায় স্টল গ্রহণ, শিল্পকলা একাডেমি, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি ও ধর্মগুরুদের নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকি এবং প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে থাকি। হেযবুত তওহীদের প্রকাশনাগুলো আন্দোলন ও পত্রিকার ওয়েবসাইটগুলোতেও প্রকাশ করা হয়।

অর্থের উৎস

হেযবুত তওহীদের সদস্যরা নিজেদের উপার্জিত বা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে আন্দোলনের কাজ করে থাকেন।

অনন্যতা

হেযবুত তওহীদ গত ১৯ বছরে দেশের একটিও আইন ভঙ্গ করে নি, এর কোন সদস্য একটিও অপরাধ করে নি। এর প্রমাণ গত ১৯ বছরে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ৪৫০টির অধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু একটি মামলাতেও এর কোন একজন সদস্যেরও কোন আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাদের কেউ সাজাপ্রাপ্ত হন নি। আইন মান্য করার এরূপ দৃষ্টান্ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর একটিও দেখাতে পারে নি।

সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ: রসুলাল্লাহর সময় যেমন পুরুষ আসহাবদের পাশাপাশি নারী আসহাবগণও জাতীয় ও সামাজিক প্রায় সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক তেমনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রায় সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। আমীরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে অফিসিয়াল কাজ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজ (যেমন: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজ, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি) এমনকি পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা শরীয়াহ নির্ধারিত যথাযথ হেজাব অনুসরণ করে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

হেযবুত তওহীদ সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে লালন করে। এমামুয্যামানের স্মরণে হেযবুত তওহীদের প্রকাশিত প্রথম গানের অ্যালবাম "দ্য লিডার অব দ্য টাইম'। সেমিনারগুলোতে হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যারা যন্ত্রানুসঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে। অশ্লীলতামুক্ত সব রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে হেযবুত তওহীদ সমর্থন করে।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমগ্র মানবজাতি আজ বহুমুখী সংকটে পতিত। প্রতিটি সামাজিক অপরাধ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তেমনি বিশ্বজুড়ে চলছে রাষ্ট্রগত যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তপাত। প্রতিটি মানবাত্মা ত্রাহিসুরে চিৎকার করছে এ যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। মানুষের পক্ষে যা যা করার ছিল তা বহু আগেই করা হয়ে গেছে। বিভিন্ন নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি করা হয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন সংঘ, জোট, সংগঠন কিন্তু সবই ব্যর্থ। এমনই দুর্যোগঘন মুহূর্তে, এই ভয়াবহ সংকটজাল থেকে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করার জন্য অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে সত্যের পথনির্দেশ দান করলেন। তিনিই হচ্ছেন হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এমন এক পরিবারের সন্তান যাঁদের কীর্তির সঙ্গে আবহমান বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এক সূত্রে গাঁথা। ১৪০০ বছর আগে যে উম্মতে মোহাম্মদী আরবভূমি থেকে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের রক্তধারা বইছে এমামুয্‌যামানের ধমনীতে। সুলতানী যুগে এমামুয্‌যামানের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গ তথা বাংলা-বিহার, ওড়িষ্যা, পুরি, ভারতের উত্তর প্রদেশসহ তদানীন্তন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। ১৫৭৬ সনে সুলতান দাউদ খান পন্নীর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার মাটি দিল্লির শাসনের অধীন হয়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষই ব্রিটিশ শাসনের পদানত হয়। তখনও এই ক্ষয়িষ্ণু কররানি নামান্তরে পন্নী রাজপরিবারের টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-বগুড়া অঞ্চলে জমিদারি বজায় থাকে। প্রজাহিতৈষী এবং ধর্মপ্রাণ জমিদার পরিবার হিসাবে তারা ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, তদুপরি ব্রিটিশ শাসনের তাঁবেদারি না করে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য তারা ছিলেন সর্বদা নিবেদিতপ্রাণ।

এ পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীও ছিলেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এমন এক মহান পুরুষ যিনি তাঁর ঘটনাবহুল ৮৬ বছরের জীবনে একটি মিথ্যা কথা বলার বা অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত রাখেন নি।

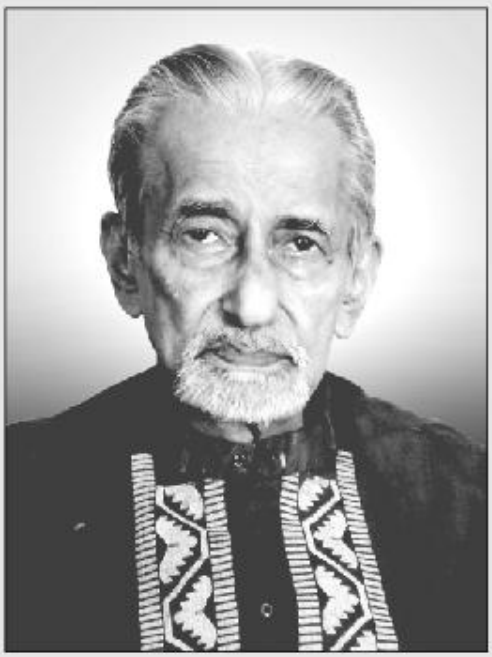

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা
মাননীয় এমামুয্‌যামান
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
মানবজাতিকে এক পরিবারভুক্ত করতে যে মহামানবের আবির্ভাব

তাঁর পিতৃনিবাস টাঙ্গাইল করটিয়ার জমিদারবাড়ি। পিতা মোহাম্মদ মেহেদী আলী খান পন্নী, পিতামহ মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরি ছিলেন তাঁর মাতামহ। এই ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে মাননীয় এমামুয্‌যামান ১৯২৫ সালের ১১ মার্চ, পবিত্র শবে বরাতের রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায়, দু'বছর তিনি সেখানে পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে। এই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি সা'দাত কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। এই সবগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন

এমামুয্‌যামানেরই পূর্বপুরুষ দানবীর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া। এরপর তিনি ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। তাঁর খালার বাড়ি বগুড়ার নওয়াব প্যালেসে থেকে প্রথম বর্ষের পাঠ সমাপ্ত করেন, দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্‌যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। এমামুয্‌যামান যোগ দিয়েছিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে। এমামুয্‌যামান ছাত্র বয়সে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত জ্যেষ্ঠ নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি তাঁর দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আল্লামা মাশরেকী কর্তৃক Special Assignment এর জন্য 'সালার-এ-খাস হিন্দ' মনোনীত হন। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর বেশ কয়েকবছর তিনি রাজনীতির সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। সুযোগ পেলেই রায়ফেল হাতে বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন। বইটি তৎকালীন পাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফুটবলার ও রায়ফেল শুটার। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

পঞ্চাসের দশকে তাঁর খালু নওয়াবজাদা মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া) ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর চাচাতো ভাই মোহাম্মদ খুররম খান পন্নীও ছিলেন আইন পরিষদের সদস্য। এভাবে পরিবারের আরো অনেকেই ছিলেন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সমসাময়িক রাজনীতিকদের পীড়াপিড়িতে এক যুগ পরে এমামুয্‌যামান আবার রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করেন এবং ১৯৬৩ সনে টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের উপনির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোট ছয়জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন।

এম.পি. থাকা অবস্থায় তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অব রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অব মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি' কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদারক্ষা, নিঃস্বার্থ জনসেবা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণে আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হয়েও তিনি প্রবীণ রাজনীতিকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও বিহারিদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। দাঙ্গায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এসময় আইয়ুব সরকার এই দাঙ্গাকে আরও উৎসাহিত করে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্‌যামান এম.পি-হয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলিতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিল এমামুয্‌যামানের দৃপ্ত পদচারণা। তিনি ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন তিনি। জাতীয় কবি কাজী নজরুলও একই গুরুর নিকট গান শিখেছিলেন। কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য ছিলেন মাননীয় এমামুয্‌যামান। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।